দিনের শেষ ছায়া

www.BanglaBook.org

——— সেলিনা হোসেন

——BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উপন্যাস

দিনের শেষ ছায়া

ঈদ সংখ্যা ২০১০

সেলিনা হোসেন

www.BanglaBook.org

জুলাই মাস।

প্রবল বৃষ্টিতে ভেসে যাচ্ছে শহর।

গালিবের মন খারাপ হয়ে থাকে।

অবিরাম বর্ষণের দিকে তাকিয়ে ভাবেন, আকাশের এ কেমন রসিকতা! মেঘ ঝরছে তো ঝরছেই, যখন শহরের অধিকাংশ মানুষের থাকার জায়গার ব্যবস্থা নেই। গৃহহীন মানুষেরা জড়ো হয়ে আছে পথেঘাটের যেখানে সেখানে।

তিনি নিজের বাড়ির কোনো কোনো ছাদের দিকে তাকিয়ে হতাশ হয়ে পড়েন এতই জীর্ণ হয়ে গেছে বাড়ি যে মাঝে মাঝে ভীষণ ভয় করে। যে-কোনো মুহূর্তে ভেঙেই পড়বে বুঝি! শ্বশুরবাড়ির দিক থেকে আত্মীয় এবং তাঁর প্রিয় সাগরেদ আলাউদ্দিন খান আনাইকে চিঠি লিখতে বসেন। কাটাকুটি করে শেষ পর্যন্ত লিখেন, মিয়া দিনকাল ভালো যাচ্ছে না। বিপদেই আছি বলতে পারো। অন্দরমহলের কোনো কোনো ঘরের দেয়াল ভেঙে পড়েছে। বিশেষ করে মহিলাদের বসার ঘরটির অবস্থা খুবই শোচনীয়। একই অবস্থা গোসলখানারও। পুরুষদের বৈঠকখানার ছাদ ফেটে জালের মতো হয়ে আছে। থাকার ঘর 'দিওয়ান খানা'র অবস্থা বলে বোঝানো যাবে না। তোমার ফুফু ভয় পান যে তাঁকে না জ্যান্ত কবরে যেতে হয়। বৃষ্টি যদি টানা দুঘণ্টা ধরে হয়, তাহলে ছাদ চুঁইয়ে পানি পড়ে চার ঘণ্টা ধরে।

চিঠিটা লিখে শেষ করলেন না। ভাবলেন, আগামীকাল লিখে শেষ করবেন। শরাবের জন্য প্রবল তৃষ্ণা তাঁকে কাবু করে ফেলে।

অতিবৃষ্টির জন্যই বেশ কিছুদিন ধরে বন্ধুবান্ধবের দেখা নেই। মহেশ দাস চিঠি পাঠিয়ে জানিয়েছিল আখের রস দিয়ে তৈরি শরাব নিয়ে আসবে। কিন্তু আর কোনো খবর নেই। হয়ত একদিন এসে যাবে। কিন্তু কবে? সে খবর কে দেবে তাঁকে?

কদিন পরে কাল্লু মিয়া এসে খবর দিল যে হাফিজ মহমুদ খান ছাড়া পেয়েছেন। বিজয়ী সৈন্যরা শহর দখলের পরপরই অনেক মুসলমানের সঙ্গে তাঁকেও আটক করেছিল। মহমুদ খান গালিবের বাড়িওয়ালা।

খবরটা শুনে তিনি বললেন, আলহামদুলিল্লাহ।

কাল্লু মিয়া আরও জানান, সেদিন যাঁদেরকে নিয়ে আটক করেছিল তাদের সবাইকে ছেড়ে দিয়েছে।

যাক সবাই জীবিত ফিরে এসেছে। কারও লাশ আমাদের গলিতে আনতে হয় নি।

জি হুজুর। আমাদের বল্লিমারোঁতে প্রাণ ফিরে এসেছে

তোমার খুব আনন্দ লাগছে কাল্লু মিয়া?

জি, হুজুর। মৃত্যু দেখতে দেখতে আমার প্রাণ আমার সঙ্গে ছিল না। আমার মনে হয় আমার প্রাণ বুঝি আমার কাছে ফিরে এসেছে।

গালিব মৃদু হেসে বললেন, খবরটা আমাকে দেওয়ার জন্য শুকরিয়া কাল্লু মিয়া।

কাল্লু মিয়া বেরিয়ে যায়। গালিব বারান্দা থেকে দেখতে পান হেলেটি বল্লিমারোঁ গলিটা এক দৌড়ে পার হয়ে গেল। ও হয়ত খবরটি আরও অনেককে দেওয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে। নিজের আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার জন্য মানুষ এমনই ব্যাকুলতা অনুভব করে। তিনি বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন। আকাশে ঘনকালো মেঘ। থমথম করছে চারদিক। বৃষ্টি নেই। খোলা হাওয়ায় হিমেল পরশ পাচ্ছেন তিনি। সবটুকু বিরক্তি সত্ত্বেও বৃষ্টির আবহে এই ভালো লাগা তাঁর মন খারাপ কাটিয়ে দেয়। ভাবেন, মহমুদ খানের সঙ্গে কাল সকালেই দেখা করতে যাবেন।

পরদিন দেখা হয় না মহমুদ খানের সঙ্গে। তিনি অন্য কোথাও বেরিয়ে গেছেন। ফিরে এসে কয়েক ছত্র লেখেন 'দস্তাম্বু'র পাতায়: আমার কান্না আর ভাবনার মাঝে মনে হয় পৃথিবী বড়ই আত্মকেন্দ্রিক। আমার মতো কোনো দুঃখী যদি ফুল ও পাতার সৌন্দর্য না দেখে, যদি মাথার ভেতর ফুলের গন্ধে ভরপুর না রাখে, তাহলে প্রকৃতির সৌন্দর্যে কি কিছুর অভাব ঘটবে, না বাতাসের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে কেউ?

ঘরে ঢুকলেন উমরাও জান।

কী খবর বিবি?

শুনলাম আমাদের বাড়িওয়ালা আর এখানে থাকবেন না।

কে বলল?

তাঁর আশ্রিতদের একজন।

কোথায় যাবে?

আগামীকালই ওরা পাতিয়ালায় যাওয়ার দিকে রওনা করবে। গোছগাছ করছে। এই বাড়িতে কেউ থাকবে না।

তালা পড়বে?

তাইতো মনে হচ্ছে।

ভবিষ্যতে কী করবেন তা আর জানা হলো না। যাহোক, দুঃখ করো না বিবি। আমরা তাঁর বাড়িতে ভাড়া আছি। যতদিন থাকতে পারি থাকব।

বেশিদিন না থাকাই বোধ হয় ভালো। বাড়ির যা অবস্থা!

এ বছরের মতো প্রতিবছরই অতিবৃষ্টি হবে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই বিবি।

আপনি যা ভালো বোঝেন, তাই করেন।

উমরাও জান ক্ষুব্ধ হয়ে বেরিয়ে যান।

গালিব ভাবলেন, আমার বোঝাবুঝির কিছু নাই। আমি তো দেখতে পাচ্ছি আমার কী হচ্ছে। ইংরেজরা দিল্লি দখলের পর থেকে পেনশন বন্ধ। লালকেল্লার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল এই অজুহাত। কবে এই দোষ থেকে মুক্তি পাব কে জানে? ততদিন আমার তো নতুন কিছু চিন্তা করার শক্তি নেই।

গতকালই মীর মেহেদী তাঁর পেনশনের খবর জানতে চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন। তার চিঠিটি আবার খাম থেকে বের করে পড়লেন। পরে কাগজ টেনে লিখলেন, মিয়া বিনা অন্নে বেঁচে থাকার কায়দাকানুন রপ্ত করেছি। বুঝে গেছি যে কীভাবে না খেয়ে বেঁচে থাকতে হয়। আমার জন্য ভেবো না। একদম নিশ্চিত থাকো। রমজান মাসে রোজা খেয়ে খেয়ে কাটিয়েছি। এরপর রিজিকের মালিক খোদা আছেন। আর কিছু যদি খেতে না পাই তাহলে কীই বা এসে যায়। আমার জন্য দুঃখ অবশিষ্ট আছে। দুঃখ খেয়েই কাটিয়ে দেব।

চিঠিটি লিখে উমরাও জানকে ডাকলেন।

কী হয়েছে? ডেকেছেন কেন?

এই চিঠিটা পড় বিবি।

কী লিখেছেন?

পড়েই দেখো।

উমরাও জান চিঠি পড়ে কড়া চোখে তাকিয়ে বললেন, আবার রসিকতা! মানুষ দুঃখ খায় কীভাবে?

রসিকতা নয় বিবি, এটাই বাস্তবতা। কবি হলে বুঝতে দুঃখ কীভাবে খাওয়া যায়।

আপনার দুঃখ খাওয়ার ব্যাপারটা আপনি বুঝুন। আমি এত নিষ্ঠুর রসিকতা বুঝি না।

উমরাও জান চিঠিটা টেবিলের ওপর রাখলেন।

গালিব তাঁর হাত ধরে বললেন, বুঝতেই যদি না পারবে তাহলে এত বছর ধরে ঘর করলে কী করে?

ঘর? ঘর কোথায়? আপনি তো বলেছেন আপনি কারাগারে আছেন। ভুলে গেছেন সেই কথা?

না ভুলি নি। ভুলব কেন?

বলব সেই কথাগুলো?

যে কথাগুলো আমি লিখেছিলাম?

হ্যাঁ, আপনিই তো লিখেছিলেন। অন্য কেউ না।

তোমার স্মরণ আছে বিবি?

কলিজার দেয়ালে গেঁথে আছে।

ঠিক আছে বলো। বললে তোমার পোড়াবুকে শান্তি আসবে।

আপনি লিখেছিলেন, ১৮১০ সালের ৯ আগস্ট তারিখে আমার জন্য যাবজ্জীবন কারাবাসের ব্যবস্থা করা হলো। একটি বেড়ি

www.BanglaBook.org

মানে বিবি আমার পায়ে পরিয়ে দেওয়া হলো। আর দিল্লি শহরে পাঠানো হলো আমাকে। দিল্লিই ছিল আমার জন্য কারাগার।

উমরাও জান রাগত স্বরেই বললেন, যে বেড়িটি আপনার পায়ে পরানো হয়েছিল সেটি কি লোহার ছিল?

গালিব চুপ করে থাকেন।

উমরাও জান আবার বলেন, আমার আব্বাজান আপনাকে দিল্লিতে এনেছিলেন। লোহারু বংশের সবাই আপনাকে এই শহরের কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে সহযোগিতা করেছিল। কে করে নি বলেন? গালিব চুপ করে থাকেন। উমরাও জান যা বলছে তার মধ্যে এক বিন্দুও মিথ্যে নেই। লোহারু বংশের সবাই তাঁর আত্মার আত্মীয়।

কথা বলছেন না যে?

তুমি ঠিকই বলেছ বিবি।

বাদশার দরবারে কে নিয়ে গিয়েছিল আপনাকে?

তোমারই বংশের কেউ।

দিল্লি যদি কারাগারই হবে তাহলে ছেড়ে গেলেই তো পারতেন। গেলেন না কেন?

গালিব প্রশ্নের উত্তর দেন না। পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে দুজনে একসঙ্গেই তো কাটালেন।

আপনি কথা বলছেন না যে?

আমার কথা বলার কিছু নেই।

আপনি আগ্রায় থাকলে আপনি এই গালিব হতে পারতেন না। কবিতার নেশা ছাড়া আপনার জীবনে আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

আহ বিবি থামো।

থামবই তো। ইংরেজদের দিল্লি দখলের প্রায় তিন বছর হতে চলল এখনো আপনার পেনশন মুক্ত হলো না।

হবে বিবি হবে, ধৈর্য ধরো।

এখন আমাকে আমার ধৈর্য খেতে হবে। আপনার খাওয়ার জন্য আছে দুঃখ, আর আমার জন্য আছে ধৈর্য। বাচ্চাগুলো খাবে হাওয়া। আর আমাদের আশ্রিতরা খাবে পানি। খাবে কি খাচ্ছেই তো।

বলতে বলতে বেরিয়ে যান উমরাও জান।

গালিব কাগজ টেনে একটি গজল লেখার চেষ্টা করেন। মনমতো হয় না। কাগজটি কুটিকুটি করে ছেঁড়েন। উমরাও জানের কথাগুলো তাঁকে খুব পীড়িত করে। কিন্তু এমন কথা তিনি অনেক বার শুনেছেন। উমরাও জানের অভিযোগের শেষ নেই। কিন্তু তরুণ বয়সে বলা সেই কথাগুলো ফিরিয়ে নেওয়ার আর তো কোনো সুযোগ নেই। জীবনের একটি দিককে তিনি যদি কারাগারই ভাবেন তবে কার কী বলার আছে! কবির জীবন তো কবিকেই বুঝতে হয়। আর এই বোঝার শেষ নেই। তার চেয়ে বেশি আর কে বুঝেছে এই সত্য!

সপ্তাহখানেক পরে বন্ধু মহেশ দাস তাঁর বাড়িতে। নিয়ে আসেন আখের রসের তৈরি শরাবের বোতল। উজ্জ্বল হয়ে ওঠে গালিবের দৃষ্টি।

বন্ধু তুমি।

দেখতে এলাম আপনাকে।

বরাবরের মতো বোতলটা পাঠিয়ে দিলেই পারতে।

পারতাম। কিন্তু ভাবলাম একবার চোখের দেখা দেখে না এলে খুব অন্যায় করা হবে।

আহ, কী মধুর বাক্য। তোমার মতো দরাজ দিল বন্ধু আমার খুব কমই আছে।

মহেশ দাস বোতলের ছিপি খুলে গালিবকে গন্ধ শুঁকতে দেয়। বলে, দেখুন তো কেমন?

হোক দেশী মদ, রং তো বিলিতি শরাবের মতো। আর গন্ধ তার চেয়েও ভালো। গরদের পর থেকে দেশী রাম আমার বুকের জ্বালা জুড়িয়েছে।

আপনার কাল্লু মিয়াকে পেয়ালা আনতে বলুন।

ডাকতে হয় না। কাল্লু মিয়া পেয়ালা আর গোলাপ জল নিয়ে হাজির হয়। মহেশ দাস পেয়ালায় রাম ঢেলে দিলে কাল্লু গোলাপ জল মিশিয়ে দেয়। গালিব এক চুমুক দিয়ে বললেন, আমার কাল্লু মিয়া তোমাকে দেখেই বুঝে গেছে যে এখন আমার কী চাই।

হ্যাঁ, ও আপনার খুব বিশ্বস্ত ভৃত্য। প্রভুর সেবায় অনুগত। ঠিক বলেছি কাল্লু মিয়া?

কাল্লু মিয়া লজ্জিত ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে চলে যায়।

গালিব আর এক চুমুক পান করে বলেন, কতদিন ধরেই চাইছিলাম যে আমার মনের বাসনা পূর্ণ হোক। শরাবের দুএক পেয়ালাও যদি পাই তাহলেও বেঁচে যাব। আজ আমার পোড়া হৃদয়ের জ্বালা জুড়ল। তুমি আমাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টায় সার্থক বন্ধু।

মহেশ দাস মৃদু হাসিতে মাথা ঝাঁকাল। বলল, এই শহরে কবিকে বাঁচিয়ে রাখার অনেক লোক আছে। আপনার গুণগ্রাহীর সংখ্যা অনেক।

সমালোচকের সংখ্যাও কম নয়।

সে তো থাকবেই। মিত্রের সঙ্গে শত্রু থাকাই তো জগতের নিয়ম।

হ্যাঁ, ঠিক। ঠিক বলেছ। আমি শত্রুদের কেয়ার করি না। শত্রুদের ব্যাপারে উদাসীন থাকাকেই আমি বুদ্ধিমানের কাজ মনে করি। তাতে নিজের বিশ্বাস কলুষিত হয় না।

ঠিক বলেছেন।

তিনি পরপর দুই চুমুক রাম পান করেন। বলেন, মহেশ বড়ই শান্তি দিলে বন্ধু। এখন শহরের খবরাখবর বলো?

আপনি তো বোধ হয় শুনেছেন যে মুরাদাবাদও ইংরেজদের দখলে এসেছে।

না, শোনা হয় নি। তবে জানতাম যে ওই শহর বিদ্রোহীদের আশ্রয়কেন্দ্র ছিল।

ওই শহরের দায়িত্ব নওয়াব ইউসুফ আলী খানকে দেওয়া হয়েছে।

তিনি তো খুবই ইংরেজ ভক্ত। তাঁকে আমি ভালো চিনি। এও জানি যে তাঁর ক্ষমতা অনেক। তিনি দুনিয়া জয় করার জন্য জন্মগ্রহণ করেছেন। রাজত্ব করার জন্যও তাঁর বাসনার শেষ নেই। যে এলাকার শাসনভার পেয়েছেন আমার বিশ্বাস এই দায়িত্ব তিনি মৃত্যুর আগে পর্যন্ত পালন করবেন।

মহেশ দাস মৃদু হাসিতে চুপ করে থাকে।

গালিব আবার জিজ্ঞেস করলেন, বেরিলীর খবর কী? দুটি শহরই তো কাছাকাছি?

এটাও দখল হয়ে গেছে। বিদ্রোহীদের এমনভাবে তাড়িয়েছে যে ওদের কেশের দেখাও পাওয়া যাবে না।

আর গোয়ালিয়র? না, দাঁড়াও, দাঁড়াও। কিছুদিন আগে তো গোয়ালিয়র জয়ের খবর পেয়েছি তোপের আওয়াজ শুনে। শহর জয়ের খবর আর বিদ্রোহীদের খতমের খবর বাতাসের বেগে পৌঁছে গেছে ঘরে ঘরে।

গালিব আরেক চুমুক পান করলেন।

মহেশ দাস বললেন, বিদ্রোহীরা গোয়ালিয়র দখল করলে মহারাজ জয়াজি রাও শহর ছেড়ে আগ্রায় চলে গিয়েছিলেন।

ওহ, তাই নাকি? তারপর?

সেখানে গিয়ে তিনি ইংরেজদের সাহায্য চেয়েছিলেন। ইংরেজরা তাকে সাহায্য দেয়। তিনি সৈন্য নিয়ে দ্বিগুণ বেগে শহর আক্রমণ করেন। বিদ্রোহীরা শহর রক্ষার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল।

শেষপর্যন্ত পারে নি, তাই না?

হ্যাঁ, তাই। তারা এমন অবস্থায় পড়ল যে লুটপাট করে বেঁচে থাকা ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় ছিল না। এরপর তারা ধরা পড়তে থাকে। তাদের ফাঁসি হয়, কিংবা গুলিতে জীবন দিতে হয়।

ওহ নসিব, নসিব।

গালিব অস্ফুট শব্দ করেন। ঠক করে পেয়ালাটা রেখে বললেন, বাহাদুর জঙ্গ খানের কোনো খবর আছে মহেশ? ও তো লালকেল্লায় বন্দি।

www.BanglaBook.org

শহরের হাকিম তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন

তাই নাকি ? কবে ?

এই তো গত বৃহস্পতিবার।

বাহাদুর জঙ্গ খান নিশ্চয় অনেক আশা নিয়েই হাকিমের সঙ্গে দেখা করেছেন।

হবে হয়ত। তবে খবর একদিক থেকে ভালো, আরেক দিক থেকে ভালো নয়।

তাড়াতাড়ি বলে শেষ করো। আমি ধৈর্য রাখতে পারছি না।

তিনি আবার পেয়ালা হাতে ওঠান। দাড়িতে হাত বোলান।

ভালো খবর হলো যে এ যাত্রা তিনি বেঁচে গেছেন। তাঁকে এক হাজার টাকা করে পেনশন দেওয়া হবে।

বাহ্, ভালোই তো।

খারাপ খবর হলো যে তাঁকে লাহোরে চলে যেতে হবে। নির্দেশ এমনই যে তাঁকে আজীবন ওই শহরে থাকতে হবে। তিনি আর দিল্লিতে আসতে পারবেন না।

ওহ্, নসিব। আবার তাঁর কণ্ঠে অস্ফুট আর্তনাদ আমি জানি এই হুকুম তাঁকে মেনে নিতেই হবে এছাড়া তাঁর আর কোনো উপায় নেই।

না, তাঁর আর কোনো উপায় নেই।

মহেশ দাসও গালিবের কথার প্রতিধ্বনি করলেন।

তোমার কাছ থেকে অনেক খবর পেয়েছি। শুকরিয়া মহেশ।

আজ যাই।

আবার কি দেখা হবে ?

দেখা যাক কবে হবে।

আমি জানি তুমি অনেক কাজে ব্যস্ত থাক।

আমি না আসতে পারলেও আপনার জন্য দেশী মদ পাঠাব। মন খারাপ করবেন না।

আমার মন তো পুড়ে খাক হয়ে গেছে বন্ধু।

ওই যে বললেন শান্তি পেয়েছেন। এই

www.BanglaBook.org

শান্তিটুকু ধরে রাখুন।

গালিব মাথা নাড়লে মহেশ দাস বেরিয়ে গেল। তিনি পেয়ালা শেষ করে কাল্লু মিয়াকে ডেকে বোতলটা তাঁর কাঠের বাক্সে রাখতে বললেন। রাতের খাবার খাওয়ার পরে 'দস্তাম্বু'তে লিখলেন, একথা আমাকে বলতেই হবে যে মহেশ দাস একজন সৎ ব্যক্তি। সে শহরে মুসলমানদের ফিরে আসার জন্য চেষ্টা করেছিল। চেষ্টাতে ত্রুটি ছিল এমনটি বলতে পারব না। তবে তাঁর চেষ্টা হয় নি। মনে হয় সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা এমন নয়। তবে হিন্দুরা ভালো আছে। ইংরেজরা তাদের প্রতি সদয়। তারা বেশ খোলামেলাভাবেই বাস করছে। মহেশ ভাগ্যবান মানুষ। আরাম আয়েশে জীবনযাপন করে। সবার সঙ্গে সৎ আচরণ করে। আমাকে পছন্দ করে। যদিও তার সঙ্গে আমার অনেককালের পরিচয় নেই। মাঝেসাজে এখানে-ওখানে দেখা হয়। সামান্য কথাবার্তা হয়। মাঝে মাঝে আমাকে উপহার পাঠায়। এতে আমি লজ্জাও পাই।

এটুকু লিখে তিনি ঘুমুতে গেলেন। দিল্লি সোরে ভোগার পর থেকে শরীরটা দুর্বল হয়েছে। আগের অবস্থায় কবে ফিরে আসবে কে জানে। আদৌ ফিরবে কিনা তাই বা কে জানে। বুক ফুঁড়ে দীর্ঘশ্বাস আসে। চাইলেন ঘুমিয়ে শরীরকে বিশ্রাম দেবেন, কিন্তু হলো না। দীর্ঘশ্বাস ঘুম উড়িয়ে নিয়ে গেল। তিনি বিছানার এপাশ-ওপাশ করলেন। উঠলেন, পানি খেলেন। দরজা খুলে বল্লিমারোর আকাশ দেখলেন। শেষ রাতের দিকে চোখ জড়িয়ে এল।

পরদিন ঘুম ভাঙল দুপুর গড়িয়ে যাওয়ার পরে। চোখ খোলার পরপরই অনুভব করলেন যে শরীর বেশ ঝরঝরে লাগছে। অবসাদ ভাব নেই। তবে কি একটা নতুন জীবন পেলেন? আবার নতুন করে শুরু হলো কবিতা লেখার দিন? তাহলে তো ভালোই হয়েছে, পুরনো দিনগুলো ঝরে গেল। মুক্ত হয়ে যাবেন অভাব থেকে। দুঃখ-কষ্ট থেকে। তিনি ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলেন।

ঘরের চারদিকে তাকালেন। না সবই তো তেমন আছে। কিছুই বদলায় নি। জানালার ঘুলঘুলি দিয়ে দুপুরের কড়া আলো এসে ঢুকেছে ঘরে। তাপও কম নয়। তাঁর কপালে, গলায়, বুকে ঘাম জমেছে। তিনি বিছানা থেকে পা ঝুলিয়ে দেন। সে পা মেঝে স্পর্শ করে। তিনি চপ্পলের জন্য নিচের দিকে তাকান। পায়ের কাছে চপ্পল নেই। কোথায় গেল? নাতিরা মাঝে মাঝে দুষ্টুমি করে লুকিয়ে রাখে। তাকে খুঁজে বের করতে হয়। আজ আর ওদের ওপর রাগ করলেন না। চপ্পল ছাড়াই বারান্দায় এলেন। দেখলেন বাড়ির উঠোনে গম্মন মিয়া বসে আছে। মাস দুয়েক আগে অভাবের কারণে ও চলে গিয়েছিল। এখন আবার কী চায়?

গালিবকে দেখে দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসে। কাঁদতে কাঁদতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে।

হুজুর।

মাথা চাপড়িয়ে কাঁদতে থাকে।

হুজুর। হুজুর।

কতবার যে শব্দটি বলেছে গালিব নিজেও বুঝতে পারেন না। কাঁদতে কাঁদতে হেঁচকি ওঠে।

কী হয়েছে তা বলবে তো গম্মন মিয়া।

হুজুর আমার বেয়াদবি মাপ করে দেবেন আপনি।

হুজুর, হুজুর—

আহ, থাম। কী হয়েছে বল।

গালিব বিরক্তি প্রকাশ করেন।

হুজুর আমি আপনার কাছে থাকতে এসেছি।

থাকতে এসেছ তো থাকো।

থাকব, হুজুর আপনি আমাকে থাকতে দিলেন?

দিলাম তো। যাও, ঘরে যাও।

আমি রুটির জন্য মরে যাচ্ছি হুজুর। আপনার এখান থেকে যাওয়ার পর আমি একদিনও ঠিকমতো খেতে পাই নি।

ঠিক, আছে যাও, বেগম সাহেবের কাছে যাও।

গম্মন মিয়া গালিবের পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়ে যায়। আয়েজ এসে টেনে তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। গম্মন মিয়া জ্ঞান হারিয়েছে। গালিবের পেছনে এসে দাঁড়ান উমরাও জান।

আপনি ওকে আবার থাকতে দিলেন।

কি করব। আমিতো তাড়িয়ে দিতে পারব না। বিবি তুমি তো জনো—

হ্যাঁ, আমি তো আপনার সবকিছু জানি। আপনি একজন দিল দরিয়া মানুষ। কিন্তু নিজের অবস্থা কি একবারও ভেবে দেখেন না?

দেখি। দেখব না কেন? আমি তো পেনশনের চেষ্টা করছি। কমিশনার সাহেবের কাছে পেনশনের আবেদন করেছি। তুমি দেখো বিবি একটা কিছু খবর আমি পেয়ে যাব। আমাদের আর বেশি দিন কষ্ট করতে হবে না।

খাওয়ার লোকের সংখ্যা কত হয়েছে জানেন?

গালিব আমত আমতা করে বলেন, আমি কি এত হিসাব রাখি না কি?

গম্মন মিয়াকে ধরলে কুড়িজন হবে আজ থেকে।

তোমাকে আমাকে সহতো?

হ্যাঁ, আপনাকে আমাকে সহই।

উমরাও জান মুখ ঝামটা দেন।

গালিব মৃদু হেসে বলেন, তাহলে বেশি না।

বেশি না? কী বলছেন?

মিথ্যে বলি নি বিবি। আমি একাই তো পাঁচজনের সমান। আমাকে বাদ দিলে পাঁচজন কমে যাবে।

আর আমাকে বাদ দিলে?

তোমাকে বাদ দিলেও পাঁচজন।

আমি তো মদ খাই না। আমার মদের খরচ নেই।

উমরাও জান রাগ করে দুপদাপ পা ফেলে যাওয়ার সময় গালিব কৌতুকের স্বরে বলেন, এক মিনিট দাঁড়াও বিবি।

কেন? উমরাও জান মুখ ফেরায়।

আয়েজ গম্মন মিয়াকে নিয়ে গেছে। লোকটার জ্ঞান ফিরলে কিছু খেতে দিও। দেখো আমার পেনশন এবার ঠিকই হয়ে যাবে।

উমরাও জান চলে গেলে তিনি পানির বালতির কাছে এলেন। মুখ ধুলেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো আজ সকালে তিনি কিছু খান নি। উমরাও জানের যা মেজাজ দেখলেন তাতে কপালে কী জুটবে কে জানে! তারপরও তিনি নিজেকে উৎফুল্ল রাখার চেষ্টা করেন। কারণ তাঁর হেফাজতে শরাবের বোতল আছে—ওই বোতলটি থাকলেই তো তিনি মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন না। পানীয় তাঁকে শক্তি দেয়। তিনি খোশ মেজাজে ঘরে ফিরে এসে দেখেন কাল্লু মিয়া দস্তরখান বিছিয়েছে। রেকাব-পিরিচের সংখ্যাধিক্য ঠিকই আছে, কিন্তু খাবারের পরিমাণ খুবই কম। হবেই তো, তিনি গামছা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ভাবলেন। কাল্লু মিয়া কাছেই বসে আছে। তিনি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, কাল্লু মিয়া রেকাব-পিরিচের বাহার দেখছি। আজ কি ভোজনের মাত্রা ভালোই হবে?

কাল্লু মিয়া মাথা নিচু করে। কথা বলে না।

আজকে আমিতো তোমাদেরকে নাস্তা মাফ করে দিয়েছি, তাই না কাল্লু মিয়া?

জি হুজুর। আমি তো দুপুরের খানার জন্য দস্তরখান বিছিয়েছি। এখন তো দুপুরের খানার সময় হয়েছে।

হ্যাঁ, তা তো ঠিকই।

গালিব দস্তরখানে বসেন। কাল্লু মিয়া চিলুমচি এগিয়ে দেয় হাত ধোয়ার জন্য। তিনি খাবার খেতে শুরু করার আগে কাল্লু মিয়াকে বলেন, মিয়া রেকাব-পিরিচের বহর দেখে মনে হচ্ছে এই দস্তরখান এজিদের দস্তরখান। আর খাবার যা দিয়েছ তা দেখে মনে হয় এই দস্তরখান ফকির বায়জীদ

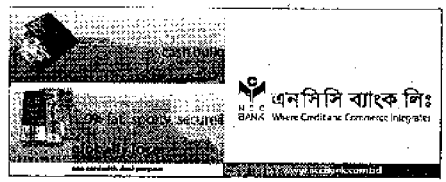

www.BanglaBook.org

বোস্তামীর দস্তরখান।

কাল্লু মিয়া তটস্থ হয়ে বলে, হুজুর---

ঘাবড়িও না কাল্লু মিয়া। আমার পেনশন হলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

হুজুর—। কাল্লু মিয়ার গলা শুকিয়ে যায়।

গালিব মিয়া অল্পক্ষণে রুটি আর ডিমের কুসুম খেয়ে শেষ করেন। এক গ্লাস পানি খেয়ে বলেন, মহল্লার কসাইরা কি দোকান খোলে নি কাল্লু মিয়া?

খুলেছে হুজুর। তবে বাকি দিতে চায় না। আগের দেনা শোধ করতে বলে।

ও হ্যাঁ, তাইতো, তাইতো। তবে পেনশন পেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। তখন তুমি কিনে কুলাতে পারবে না। কী বলো, ঠিক বলেছি?

জি হুজুর। আগে তো এভাবেই কিনেছি। বাড়িতে থাকত কাবাব, কোর্মা, গোস্তের সুরুয়া–

থামে, থামে হয়েছে। তুমি কি জানো এজিদ কে?

তিনি নবীজীর নাতি ইমাম হুসেনকে হত্যা করেছিলেন।

আর বায়জীদ বোস্তামী?

তিনি ফকির দরবেশ মানুষ।

বাহ্, তুমি তো বেশ জ্ঞান রাখ দেখছি। খাঁটি মুসলমান। নাকি?

কাল্লু মিয়া লজ্জা পেয়ে মুখ নিচু করে দস্তরখান গোটাতে থাকে। গালিব হাসতে হাসতে বলেন, কাল্লু মিয়া নসিব আপনা, আপনা।

কাল্লু মিয়া ঘর ছেড়ে হাঁফ ছাড়ে। হুজুর এমনই। কখন যে কী প্রশ্ন করবেন তার কোনো ঠিক নেই।

দিন সাতেক পরে তিনি কমিশনার সন্ডার্সের কাছে গেলেন পেনশনের খোঁজ নিতে। সন্ডার্স তাঁকে বসতে দিলেন। একটি কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললেন, এখানে আপনাকে নিয়ে একটি খবর ছাপা হয়েছে।

গালিব কাগজটির দিকে তাকিয়ে বুঝলেন, সেই পুরনো বিষয়টি এই ইংরেজ আবার সামনে আনতে চাইছে। বিদ্রোহের সময় এ দেশীয় একজন ইংরেজদের স্পাই হিসেবে কাজ করত দরবারে। নানা খবর পাঠিয়ে দিত পাহাড়ে অবস্থিত ব্রিটিশদের আস্তানায়। সে সময়ে এই বলে খবর ছাপা হয়েছিল যে নতুন বাদশাহী মুদ্রায় যে কবিতাটি মুদ্রিত হবে তা আসাদুল্লাহ খাঁ গালিবের লেখা। তিনি তাঁর কবিতা বাদশার কাছে পেশ করেছেন। গালিব কাগজটি হাতে নিয়ে সন্ডার্সের মনোভাব আঁচ করতে পারলেন। তারপরও চুপচাপ বসে রইলেন। ভাবলেন, নিজে কিছু বলার আগে প্রশ্নটি সন্ডার্সের কাছ থেকেই আসুক।

সন্ডার্স ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কিছু বলার আছে?

এ ব্যাপারে আমি আগেও যে কথা বলেছি, এখনো সে কথাই বলতে চাই যে, আমি যদি এ কবিতা লিখে থাকি তাহলে দরবারের কাগজপত্রে আপনারা তার উল্লেখ পেতেন। কিন্তু আমি জানি দরবারের কাগজপত্রে এ বিষয়ে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

কমিশনার সন্ডার্স গম্ভীর মুখে চুপ করে রইলেন। কোনো উত্তর দিলেন না। গালিব তার মুখ থেকে তার মনোভাব বুঝতে পারলেন না। তারপরও বললেন, আপনি হাকিম আহসানউল্লা খানের কাছে এ বিষয়ে জানতে পারেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করুন।

সন্ডার্স এবারও কিছু বললেন না। গালিব বিদায় নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন শুকনো মুখে বাড়ি ফিরলেন। কাউকে কিছু বললেন না। ভাবলেন, দেখা যাক কী হয়।

কয়েকদিনের মধ্যে জানতে পারলেন সন্ডার্স বদলি হয়ে গেছেন। তার আগে গালিবের পেনশন বিষয়ে যে নোটটি লিখে যান তা গালিবকে খুব মর্মাহত করে। সন্ডার্স লিখেছেন আসাদুল্লাহ খান ফারসি ভাষার খ্যাতিমান কবি। কিন্তু তার কবিতা আমাদের বিবেচনার বিষয় নয়। এ ব্যাপারে আমাদের আগ্রহও নেই। তিনি মোগল বাদশার কর্মচারী ছিলেন এবং তাঁর মুদ্রার জন্য কবিতা লিখে দিয়েছিলেন। আমার বিবেচনায় তিনি পেনশন পাবার যোগ্য নন।

সেদিনও বাড়ি ফিরে নিশ্চুপ শুয়ে রইলেন। কাউকে কিছু বললেন না। ভাবলেন, তাঁর পেনশন বিষয়ে সরকারের প্রত্যাখ্যানপত্র পেলে তবেই সবাইকে বলবেন। সন্ডার্স যে নোট লিখে রেখে গেছেন তারপর আর তো পেনশনের আশা

www.BanglaBook.org

করা যায় না। সামনের অনিশ্চিত দিনের কথা ভেবে স্তব্ধ হয়ে থাকেন।

পরদিন মির্জা মেহেদীকে চিঠি লিখলেন: ভাবছি দিল্লিতে আর থাকব না। শহর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাব।

এটুকু লিখে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেললেন। কী হবে লিখে, আগে সরকারি চিঠিটি আসুক।

দৌড়াতে দৌড়াতে বারিক আর হুসেন ঘরে ঢোকে।

কী চাই তোমাদের?

আমরা কলম চাই।

কলম? কলম কী হবে?

হুসেন বলে, আমি যে আরবি পড়তে শিখছি। আমি লিখব।

আচ্ছা ঠিক আছে। তোমাকে কলম দেব।

এক্ষুনি দিতে হবে।

এখন কোথায় পাব। কলম তো বানাতে হবে। আমাকে সময় দাও।

আচ্ছা দিলাম। হুসেন ঘাড় কাত করে বলে।

বারিক টেবিলের ওপর রাখা চিঠির টুকরো হাতে নিয়ে বলে, নানাজান আপনি কাগজ ছিঁড়েছেন কেন?

এটা হলো কাগজ ছেঁড়া খেলা।

খেলা?

বারিক অবাক হয় খেলা শুনে। বলে, তাহলে আমরা কাগজ ছিঁড়লে নানাজান বকে কেন?

কারণ কাগজ ছেঁড়া ছোটদের খেলা নয়।

শুধু বড়দের খেলা?

দুভাই হেসে গড়িয়ে পড়ে। হাসতে হাসতে বলে, বড়রা কি খেলতে পারে? নানাজান আপনি তো ঠিকমতো হাঁটতেই পারেন না। আপনার আবার খেলা কী? তাহলে চলেন আমাদের সঙ্গে খেলবেন।

তোমরা এখন যাও ভাইয়ারা।

দুই ভাই চলে গেল।

তিনি আবার কাগজ-কলম নিয়ে বসলেন। চিঠির, একটি কাগজ ছিঁড়েছেন তো কী হয়েছে, আরেকটি লিখবেন। এক বন্ধুকে লিখতে ইচ্ছে না হলে, অন্য বন্ধুকে লিখবেন। ভাবলেন কাকে লিখবেন সেটা পরে ঠিক করবেন, কিন্তু চিঠিটা তো লেখা হোক। কয়েক দশক আগে দিল্লিতে আসার পরে কবিতা লেখা এবং মুশায়রায় অংশ নেওয়ার কারণে কতজনের সঙ্গেই তো সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তাদের সঙ্গে চিঠির আদান-প্রদান সখ্যের জায়গা বড়ই করেছে। তিনি চিঠি লিখতে এবং উত্তর পেতে আনন্দই পান। এটাও একটি মজার খেলা। বাচ্চারা শুনলে হাসবে, কিন্তু ওদের কী করে বোঝাবেন যে খেলার অর্থ কত হাজার রকম। একসময় তাঁর কলম চলতে শুরু করে কাগজের ওপরে-প্রিয় বন্ধু, দিল্লিতে এখন যারা বসবাস করছে তাদের মধ্যে রয়েছে হিন্দু, পাঞ্জাবি আর ব্রিটিশ। আর অন্যদিকে রয়েছে সৈন্য আর কারিগর। আমি যে ভাষায় কবিতা লিখি তুমি তার প্রশংসা করো ভেবে দেখো যাদের কথা বলেছি তাদের মধ্যে কয়জন আর আমার ভাষা ব্যবহার করে? বলো বন্ধু, নিজামুদ্দিন, সামসুন কোথায়? জকই বা কোথায়? আর মোমিন খান? আমরা এদেরকে হারিয়েছি। বেঁচে আছে মাত্র দুজন কবি। একজন আজুরদা। তিনি এখন নির্বাক হয়ে যাওয়া কবি। বেঁচেই আছেন মাত্র। আর একজন হলেন গালিব। তিনি হতবাক হয়ে নিজের কাছে নিজেই মুছে গেছেন। বলতে পারো নিশ্চিহ্ন কবি তিনি এখন। কবিতা লেখা আর তার সমালোচনার জন্য কেউ কোথাও নেই। কবিতার ভালো বলার কেউ নেই, মন্দ বলারও না। ফৌজ আর কারিগর যে শহরে সংখ্যায় বেড়ে যায় সে শহরে আত্মা বলতে আর কি কিছু টিকে থাকে বন্ধু?

ইংরেজরা শেষ অবধি শহর পরিবর্তনের সিদ্ধান্তে খানিকটা নমনীয় হয়েছে। তারা লালকেল্লাকে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয় নি। প্রতিশোধের স্পৃহাকে দমন করেছে। লাহোর ও দিল্লি তোরণের নাম বদল করেছে ভিক্টোরিয়া ও আলেকজান্দ্রা। জানোই তো প্রাসাদটিকে আগেই ব্যারাকে পরিণত করা হয়েছিল, আস্তে আস্তে অন্যান্য অনেক সৌধের সঙ্গে জামে মসজিদ আর গাজীউদ্দিন মাদ্রাসাকেও ব্যারাকে পরিণত করা হয়েছে। ভাবতে পারো অপরূপ কারুকাজ করা ফতেপুরী মসজিদ এক হিন্দু ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করা হয়েছে। ওটা এখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি। পয়োয়ানা জারি করে জিনাতুল মসজিদকে পাউরুটির কারখানা বানানো হয়েছে।

গালিব আর লিখতে পারলেন না। অসম্ভব কষ্টে তাঁর হাত থেমে গেল। ভাবলেন নিজের শহরের চিরচেনা ছবিটি বদলে যাওয়ার কষ্ট বহন করার চেয়ে কবিতা নিয়ে ডুবে থাকা কি বেশি ভালো হবে না? পরক্ষণে মনে হলো কই তেমন করে এখনতো আর গজলের অনেক পঙ্‌ক্তি বুকের ভেতর খই খই করে না। তা হলে আমি কি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার শেষ ধাপে অবস্থান করছি? এখন কি আমার সময় শুধুই বেঁচে থাকার কারণে বেঁচে থাকা? এখন কি আমার সময় মৃত্যুর দিন গোনার জন্য? তাঁর ভীষণ মন খারাপ হয়। তিনি মানসিকভাবে বিপন্ন বোধ করেন। আওড়াতে থাকেন নিজের শের:

আমার অজস্র নিহত যাঞ্ছা মীনের চাদর দিয়ে ঢাকা রয়েছে; নিঝঝুম গোরস্তানে আমি একটি নিভে-যাওয়া দীপ॥

দুদিন পরে ঠিক করলেন একদিন ঘরের দরজা বন্ধ করে 'দস্তাম্বু'র উপসংহার লিখে শেষ করবেন। তারপর ছাপার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। তাই করলেন। একদিন দিনের শুরুতে নাস্তা খেয়ে কাগজ-কলম নিয়ে বসলেন।

শুরু করলেন লেখা: এই দিনলিপি লেখার যে সময় আমি নিয়েছি তা গত বছরের মে মাস থেকে এই বছরের জুলাই পর্যন্ত। সব ধরনের ঘটনাই আমি সংযোজন করার চেষ্টা করেছি। আগস্ট মাস থেকে আমি আর লিখি নি। হায় খুদা, যদি আমার তিনটি ইচ্ছা পূরণ হতো! আমি চেয়েছিলাম খেতাব, খিলআত ও পেনশন। আমার সব ইচ্ছা এই তিনটি বিষয়কে নিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে।

তোমরা দেখতে পাও না যে পাহাড়ের অবয়ব জুড়ে বিচিত্র রঙের চিত্রকর্ম সুসজ্জিত হয় রানির জন্য। তাঁর সিংহাসনকে সম্মান দেখায় সূর্যও। রানি যদি মুক্তা ছড়াতে চন কিংবা বিতরণ করেন তবে সেই অগণিত মুক্তা গণনা করা কার সাধ্যি?

তাঁর সেনাবাহিনী বিস্তৃত সাগর ও অতিক্রমনীয় পর্বতমালা অতিক্রম করে। তাকে ধ্বংস করার মতো তুলনীয় আর কে আছে?

তাঁর সাম্রাজ্যের গৌরবগাথা বলার অপেক্ষা রাখে না। যত বড় বাদশাহই হোক না কেন তাঁর সামনে নতজানু হন।

এই করুণাময়, অত্যুজ্জ্বল অবস্থানের দ্বারা পৃথিবী জুড়ে বুদ্ধিমান মানুষেরা উপকার লাভ করেন এবং তাঁদের দ্বারা উপকৃত হন অন্য মানুষেরা।

তাঁর উদারতা সীমাহীন; তাঁর ব্যক্তিত্ব অতুলনীয়। তাঁর ধীশক্তি অপরিমেয়। তাঁর নাম মালিকা-এ-আলম ভিক্টোরিয়া।

খোদাতালা তাঁর প্রতি সদয় হোন। তাঁর প্রসাদে এই মহফিল দীর্ঘস্থায়ী হোক।

রানি যদি আমার প্রতি সদয় হন। যদি তাঁর দয়ায় আমি কিছু লাভ করি, তাহলে এই দুনিয়া থেকে আমি নিঃস্ব হয়ে ফিরব না।

এ পর্যন্ত এসে আমি থেমে গেলাম। আমি গল্প সোনাতে চাই না। বইয়ের নাম রাখা হলো 'দস্তাম্বু'। এই বই বিভিন্ন জনকে দেওয়া হবে এবং নানা জায়গায় পাঠানো হবে। আমার বিশ্বাস ন্যায়ধর্মী মানুষের শব্দে এই ফুলের তোড়াটি রঙিন ও গন্ধময় হয়ে উঠবে। আর কুচক্রী স্বভাবের লোকদের হাতে আগুনে বোমায় পরিণত হবে। আমিন...। (সমাপ্ত)

চেয়ারে মাথা হেলিয়ে তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লেন। যাক একটি কাজ সম্পন্ন তো হলো। এই বই ইংরেজদের হাতে পেলে তাঁর রানির প্রশংসায় প্রীত হবেন। তাঁর পেনশনের সুরাহা হবে। সিপাহীদের প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল বলে তাঁদের যে অবিশ্বাস তাঁর প্রতি সেটা কাটবে বলেও মনে হয়।

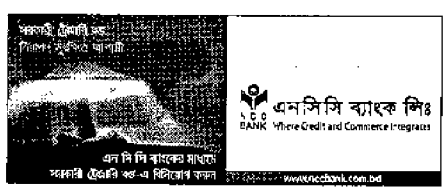

www.BanglaBook.org

দিনলিপি শেষ করার পরও তাঁর অবসাদ কাটে না। যতই নানাভাবে নিজেকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করুন না কেন তারপরও বারবারই মনে হয় তিনি একজন অসহায় মানুষ। তাঁর চারপাশে সেই পরিচিত জনরাতো নেই যাঁরা তাঁকে আত্মগর্বী কবি হিসেবে জানতেন। তিনি স্পষ্টবাদিতার জন্য সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন। এখন তিনি পরিবার পালনের দায়ে কবিসত্তা হারিয়ে ফেলেছেন। এখন তাঁর কলম চলে না। সাদা কাগজের পৃষ্ঠা ভরে ওঠে না। এখন তিনি শূন্য পৃষ্ঠার দিকে তাকিয়ে নিজের দীর্ঘশ্বাসই শুনতে পান কেবল।

দিনলিপির পৃষ্ঠাগুলো গুছিয়ে যত্ন সহকারে এক জায়গায় রাখলেন। বই ছাপানোর জন্য কী উদ্যোগ নেওয়া হতে পারে সে ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা শুরু করলেন। অথচ দ্রুত ছাপার কাজ শেষ করে ইংরেজদের হাতে তুলে দিতে হবে। রানির কাছে পেশ করতে হবে। নইলে পেনশনের আশা গুড়েবালি হয়েই থাকবে।

মন খারাপ হয়ে গেল দিল্লির অবস্থা ভেবে. এই শহর এখনো স্বাভাবিক নয়। এখানে ছাপার কাজ চিন্তা করাও যাবে না।

তুফতা সিকান্দারাবাদে থাকে। তাঁর সাহায্য নেওয়ার কথাই ভাবলেন তিনি। তুফতাই পারবে চমৎকার করে বইটি ছেপে বের করতে। বইটির ছাপার ওপর তাঁর ভবিষ্যতের অনেককিছু নির্ভর করছে। বইটি পড়লে ইংরেজদের যে অবিশ্বাস জন্মেছে তার ওপরে সেটা দূর হবে। তিনি মনে মনে খানিকটুকু আশ্বস্ত হলেন। তুফতাকে চিঠি লিখতে বসলেন। লিখলেন: বন্ধু, তোমাকে যেভাবে এই চিঠি লিখছি, এই একই হাতের লেখায় আমার দিনলিপির পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছি। বুঝতে পারছ যে টানা হাতের লেখা। খুব ঘন করে অর্থাৎ শব্দের সঙ্গে শব্দ লাগিয়ে লিখি নি। তবে ফাঁক ফাঁক করেও লিখি নি। এক পাতায় উনিশ থেকে বাইশটি লাইন লিখেছি। সব মিলিয়ে কুড়ি পাতা লেখা হয়েছে।

তুমি তো জানো এখন দিল্লি শহরের অবস্থা কী! তা ছাড়া এখানে ভালো প্রেসও নেই। যেটি আছে তার কাজের মন ভালো নয়। আগ্রায় ছাপার কাজ করা গেলে ভালো হয়। যদি করা যায় তাহলে আমাকে চিঠিতে জানিও। তুমি তো জানো আমার টাকা নেই। খুব বেশি হলে পঁচিশ কপির খরচ দিতে পারব। কিন্তু আমি তো জানি কোনো প্রেসই এত কম সংখ্যার বই ছাপবে না। হাজার কপি ছাপাতে না পারলেও, পাঁচশ কপি তো ছাপাতেই হবে। বিতরণের জন্য অনেক কপি লাগবে আমার।...

চিঠিটি নিজের বানানো খামে ভরে কাল্লুকে ডাকলেন ডাকে পাঠানোর জন্য। মনে হচ্ছে পারলে কাল্লুর পিঠে ডানা লাগিয়ে পাঠিয়ে দিতেন ওকে. ও উড়তে উড়তে চলে যেত তুফতার কাছে। এখন যে দেরি করার সময় নেই আর। সময়ের পিঠেই ডানা লেগেছে। ওটা উড়ে উড়ে চলে যাচ্ছে। সেই ওড়ার সঙ্গে তাল মেলানো কঠিন।

কাল্লু চিঠি নিয়ে চলে গেলে মনে হলো অনেকদিন বন্ধু গুলাম নজফ খানকে চিঠি লেখা হয় নি। যে তাড়না থেকে দিনলিপি ছাপানোর তাগিদ বোধ করছেন সে সূত্র ধরেই চিঠিটা লিখতে শুরু করলেন : বন্ধু, পরিবারের দেখাশোনা করা আমার কাছে এখন মৃত্যুর অধিক। পারিবারিক বন্ধন আমাকে এতটা জীবন পর্যন্ত কষ্টই দিয়েছে। তুমি তো জানো বন্ধু আমার একজন সন্তানও বেঁচে নেই। আমি সন্তানহীন অবস্থায় জীবন কাটিয়েছি। এজন্য আমি খুদাতালার কাছে শুকরিয়া আদায় করেছি। আমি তো নসিবকে মেনে নিয়েছিলাম। এখন মনে হয় সৃষ্টিকর্তার প্রতি আমি যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলাম সেজন্য তিনি খুশি হন নি, গ্রহণও করেন নি। যে লোহা দিয়ে তিনি আমার পায়ের বেড়ি তৈরি করেছিলেন, সেই একই লোহা দিয়ে হাতকড়াও তৈরি করে দিয়েছেন। এখন কান্নাকাটি করে আমার আর কী হবে! এই সবই আমার সারা জীবনের দাসত্ব—

আর লিখতে পারলেন না। ভাবলেন, একজনের মানুষের সঙ্গে এত বছর বাস করার পরও সংসার তাঁকে টানতে পারল না। কেবলই তিক্ত হয়ে ওঠে মন। আসলে কি সংসার তার কাছে বোঝা হয়ে গেছে ? এত মানুষের ভরণপোষণের ভার আর বহতে পারছেন না ? খুবই কষ্ট হচ্ছে—হয়তো তাই।

তিনি অন্দরমহলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। বেশ কয়েকদিন হলো যে তিনি অন্দরমহলে যান নি। বহির্মহলে তাঁর সময় কাটে। এটা তো দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে।

উমরাও জানের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলেন তিনি বাচ্চা দুটোকে নিয়ে বেশ আনন্দে আছেন। লুকোচুরি খেলছেন। বাচ্চারা ঘরের বিভিন্ন জায়গায় লুকোচ্ছে আর তিনি ওদের খুঁজে বের করছেন। দৃশ্যটি তিনি উপভোগ করলেন। ভাবলেন, ভালোই তো আছে ওরা।

একসময় কাশি দিলে তিনজনই তার দিকে ঘুরে তাকাল।

নানাজান এসেছেন, নানাজান।

বারিক আর হুসেন দৌড়ে এসে তাঁর হাত ধরল। উমরাও জানও এগিয়ে এসে বলে, আসেন। বসেন।

গালিব ঘরে ঢুকে স্ত্রীর বিছানার ওপরে বসেন। উমরাও জান মৃদু হেসে বলেন, কী মনে করে অন্দরমহলে ঢুকলেন ?

কিছু তো মনে হয় নি বিবি। কেন এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে ?

না, মানে, আমি তো আপনার পায়ের বেড়ি।

এখন আমি মন ভালো করার জন্য তোমার কাছে এসেছি বিবি।

মন ভালো নেই ? উমরাও জান ভুরু কপালে তোলে।

চারদিকের চাপে আমার দিল পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, আপনার ওপর চাপ বেশি। কী আর করবেন ? নসিব আপনা আপনা

সবই খুদার ইচ্ছা। কাল্লুর মা কেমন আছে বিবি ?

এখন ভালো।

মাদারির বউ ?

সেও ভালো আছে। ঠিকমতো কাজ করছে। কোনো ঝামেলা করছে না।

হুসেনের দেখাশোনার জন্য যাকে রাখা হয়েছে সেই মহিলা ?

হুসেন তুমি বলো তোমার খাদিমা কেমন আছে ?

খাদিমা খুব ভালো আছে নানাজান।

তোমাকে ঠিকমতো দেখাশোনা করতো ?

হ্যাঁ, করে। অনেক আদর করে আমাকে। আমি খাদিমাকে ডেকে আনব ?

না, না এখন ডাকতে হবে না।

তাহলে আমি খাদিমার কাছে যাই।

দুভাই ছুটে বেরিয়ে যায়। বারান্দায় ওদের পায়ের শব্দ শোনা যায়।

ওরা আমাকে অনেক শান্তিতে রেখেছে। ওরা না থাকলে আমি অসুস্থ হয়ে যেতাম।

সবই আল্লার ইচ্ছা বিবি। মনে করো আমাদেরও শৈশব ছিল।

ছিল। খুবই চমৎকার দিন কাটিয়েছি আমি।

যদিও আমার আব্বাজান, চাচাজান মারা গিয়েছিলেন তবু আমি ভালো ছিলাম। আগ্রা আমার সুখের স্মৃতি। আমার বন্ধু বংশীধরের সঙ্গে আমি ঘুড়ি ওড়াতাম। দাবা খেলতাম। যমুনা নদীর ধারে বেড়াতে যেতাম।

আমিও বংশীধরের কথা শুনেছি। তিনি তো দিল্লিতে আমার আব্বার বাড়িতে আপনাকে দেখতে আসতেন।

অনেক বছর ওর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি।

খবর দিলে আসবেন।

মেহমানকে আপ্যায়ন করব কী দিয়ে ? বন্ধুকে বেড়াতে আসতে বলার অবস্থা আমার নেই।

থাক এসব।

হ্যাঁ, থাক এসব কথা। দিল্লিতে আমাদের কোনো আনন্দের স্মৃতি তোমার মনে আছে বিবি ?

www.BanglaBook.org

উমরাও জান এক মুহূর্ত চিন্তা করে বলেন, আছে, আছে। একটা সুন্দর স্মৃতি আমার মনে আছে।

গালিব কেলবালিশে পিঠ হেলান দিয়ে বলেন, বলো বিবি, বলো। একটা সুন্দর স্মৃতির মধ্যে বর্তমানের সময় ভুলে থাকতে চাই। আমার জীবনে এমন দোজখে থাকা আর কখনো হয় নি। তোমার সুন্দর স্মৃতির কথা বলো বিবি।

মনে আছে আমার আব্বা আমাদের দুজনকে সলোনো উৎসবে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমরা লালকেল্লায় গিয়েছিলাম। সেদিন আমরা দুজনে বাদশাহকে দেখেছিলাম।

হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে। সলোনো মেলা দেখে কী মজা পেয়েছিলাম! সলোনো মেলা ছিল রাখী উৎসব।

আমরা দুজনে দুজনকে রাখী বেঁধে দিয়েছিলাম।

আমি যখন তোমাকে রাখী বেঁধে দেই তখন তুমি খুব লজ্জা পেয়েছিলে। দোপাট্টা দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছিলে।

তুমি কোনো লজ্জা পাও নি। আমি যখন তোমাকে রাখী বেঁধে দেই তুমি মিটিমিটি হাসছিলে।

গালিব সোজা হয়ে উঠে বসে বলেন, আমি লজ্জা পাব কেন? আমি না পুরুষ?

তখন আপনার রূপের খুব বাহার ছিল। লোকে আপনার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকত। আপনার খুব আনন্দ হতো না?

হতোই তো হবে না কেন? মানুষের দৃষ্টির সামনে রাজপুত্রের মতো ঘুরে বেড়াতে আমি খুব মজা পেতাম। ভাবতাম দিল্লি শহরের সব অবিবাহিতা মেয়েরা আমার দিকে তাকিয়ে থাকুক।

কথা বলে নিজেই হো-হো করে হাসলেন।

উমরাও জানের গায়ে হাসির শব্দ জ্বালা ধরায়। তিনি হাসি উপেক্ষা করে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকেন। খানিকটা বিরক্ত বোধ করেন। যদিও মনে মনে স্বীকার না করে পারেন না যে যৌবনে মানুষটি অসম্ভব সুদর্শন ছিলেন। নিজেও মুগ্ধ ছিলেন তাঁর প্রতি। কখনো দূর থেকে দেখতেন, কখনো বিছানায়। নানাভাবেই তো তাঁকে দেখেছেন তিনি। কিন্তু নানা কারণে সম্পর্কে চির ধরল। মাতাল মানুষটিকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। বেহিসাবী খরচপত্রে সংসারে অভাব তৈরি করতেন। এটিও তিনি সইতে পারতেন না।

তার ভাবনার রেশ কেটে গেল গালিবের ডাকে। গালিব তার হাত ধরে বললেন, বিবি তুমি আমার প্রথম নারী, যার রূপে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু বিয়ের বন্ধনে তুমি আমার পায়ের বেড়ি হয়ে গেলে। নইলে আমি তোমাকে নিয়ে পঙ্খীরাজ নৌকা ভাসাতাম যমুনায়। তুমি দেখতে পেতে নদীর দুধারের মানুষ আমার দিকে ফুল ছুড়ে দিচ্ছে। কারণ আমি ওদেরকে শুনিয়েছিলাম প্রেমের কবিতা।

প্রেম? হেসে ওঠেন উমরাও জান।

প্রেম কী?

গালিব বিব্রত হয়ে চুপ করে থাকেন। ভাবলেন, যে নারীকে পায়ের বেড়ি বলেছিলেন তার কাছে প্রেম কী? সত্যি তো, উমরাও জানত প্রেম নিয়ে প্রশ্নই করবে। তিনি চুপ করে গেলেন।

চুপ করে গেলেন যে?

গালিব কিছু বললেন না।

উমরাওজান তাঁর মুখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। তারপর মৃদু হেসে বললেন, প্রেমের শের একটি শোনান আমাকে। কতদিন পর আমার বিছানায় এসে বসলেন।

তুমি খুশি হও নি বিবি?

খুশি? হ্যাঁ খুশি তো হয়েছি।

তাহলে প্রেমের শের শোনান।

গালিব হেসে বললেন:

'প্রেমের কৃচ্ছসাধকদের খবর আর কী শুনবে,

তারা ক্রমশ আপাদমস্তক দুঃখের মূর্তি হয়ে গেল।'

উমরাও জান বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন, এমন প্রেমের শের আমি শুনতে চাই নি।

গালিব হেসে বললেন:

'শতবার প্রেমের বন্ধন থেকে আমি মুক্ত হলাম,

কিন্তু কী করি, হৃদয়ই মুক্তির পরিপন্থী।'

হলো না। খুশি হতে পারিলাম না

তোমাকে আর কী দিয়ে খুশি করব বিবি? আমার সাধ্যই বা কী। তাহলে আরেকটি শের শোনো:

বুলবুলের কাণ্ডকারখানা দেখে ফুল হাসছে—

যাকে প্রেম বলে সে তো মস্তিষ্কের বিকার।'

শব্দ করে হেসে ওঠেন উমরজান। হাসতে হাসতে বলেন, থাক, আর বলতে হবে না।

তুমি খুশি হও নি বিবি?

খুশি? হ্যাঁ হ্যাঁ খুশি— হ্যাঁ খুশি তো—

উমরাও জান কী বলবেন তা বুঝতে পারেন না। শেষে বলেন, আমরা সলোনো মেলার কথা বলছিলাম সেটা একটা দারুণ খুশির দিন ছিল।

আমি তোমাকে সেই মেলার কথা বলি?

হ্যাঁ, ওই গল্পটা শুনতে আমার খুব ভালো লাগবে।

উমরাও জান পা গুটিয়ে বসেন। সুন্দর স্মৃতির সঙ্গে যুক্ত ঘটনাটি তাঁকে কৈশোরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। তিনি স্মৃতি ধরে রাখতে চান। সংসারের টানাপোড়েনে কিছু কিছু জিনিস হারিয়ে ফেলা ঠিক নয়। যেমন এই বয়সে তাঁর স্বামী প্রেমের আনন্দ হারিয়েছেন। যে আনন্দ নিয়ে তিনি যমুনা নদীতে পঙ্খীরাজে চড়ে প্রেমের গজল গাইতে চেয়েছিলেন সেই প্রেম এখন তাঁর হৃদয়ে নেই। উমরাও জান এজন্য দুঃখ পান না। বরং সুখ অনুভব করেন। ভাবেন, আজ রাতটি তিনি ভালোভাবে ঘুমিয়ে কাটাতে পারবেন।

সেই রাখি বন্ধনের ঘটনাটা শুনবে না?

শুনব তো। আপনি বলুন।

আমাদের বাদশা বাহাদুর শাহ্ জাফরের দাদা ছিলেন শাহ আলম। তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন তাঁর উজির সাজিউদ্দিন খান। একদিন উজির তাঁকে ফিরোজ শাহ দুর্গে নিয়ে হত্যা করেন।

উহ্, মাগো। উমরাও জান অস্ফুট শব্দ করেন।

শুনতে ভালো লাগছে না?

ভালো লাগছে না ঠিকই, কিন্তু আপনি বলুন। আমি শুনব।

তারপর বেশ কয়েকদিন লোকজন তাঁর খোঁজ পান নি। সেজন্য লাশ পড়ে ছিল। একদিন সলোনো নামের একজন হিন্দু মহিলা লাশ দেখে এগিয়ে যান চিনতে পারেন যে সেটি বাদশার লাশ। মহিলা একা একা লাশ পাহারা দেন। কোনো ওয়ারিশ সেখানে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি লাশ ছেড়ে সেখান থেকে সরে যান নি। পরবর্তী সময়ে সিংহাসনে বসেন দ্বিতীয় আকবর শাহ। তিনি সলোনোকে বোনের মর্যাদা দেন। সলোনোও বাদশাকে ভাই মনে করতেন। হিন্দুরীতি অনুযায়ী তিনি বাদশাকে রাখী বন্ধনে বরণ করেন।

বাহ্ সুন্দর। উমরাও জান উৎসাহিত হন।

পরের ঘটনা আরও সুন্দর। প্রতিবছর রাখি মিলনের দিনে সলোনো মিষ্টির থালা নিয়ে আসতেন বাদশার কাছে। নিজের হাতে বাদশাকে মিষ্টি খাইয়ে দিতেন। হাতে লাল সুতো বেঁধে দিতেন। আর বাদশা দ্বিতীয় আকবর শাহ মুক্তোর মালার রাখী বেঁধে দিতেন সলোনোর হাতে। তারপর স্বর্ণমুদ্রা আর ঝুলি উপহার দিতেন তাঁকে।

উমরাও জান উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন; বাহ্ কী সুন্দর!

তারপর কী হলো জানো? আমাদের বাদশা বাহাদুর শাহ জাফরও এই কাজ করতেন। তিনি সলোনোর মেলা উদ্‌যাপন

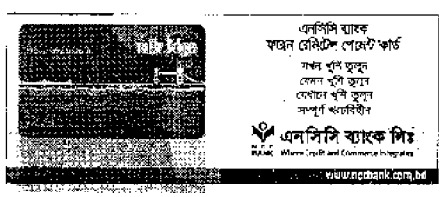

www.BanglaBook.org

শুরু করেন। এর মধ্যমে সলেমানের সন্তান-সন্ততির সঙ্গে বাদশার সুসম্পর্ক বজায় থাকে।

তা ছাড়া রাখী মেলা সাধারণ মানুষের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে।

মানুষে-মানুষে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠার জন্য এটা একটি ভারি সুন্দর দিন ছিল।

এখন তো বাদশা নেই। রাখী মেলা কি আর হবে?

গালিব চুপ করে থেকে বলেন, কী জানি হবে কিনা।

হলে বেশ ভালোই হয়।

আপনি কি এমন সুন্দর দিনের কথা মনে করে খুশি হয়েছেন?

হ্যাঁ, আমি খুব খুশি হয়েছি বিবি। তোমাকে হাজার শুকরিয়া।

তিনি উমরাও জানকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে টান্টান হয়ে শুয়ে পড়লেন বিছানায়।

উমরাও জান বুঝলেন তাঁর স্বামী আজ তার বিছানায় রাত কাটাবেন। শোকর আল হামদুলিল্লাহ।

কয়েকদিন পর আগ্রা থেকে এলেন মুনশী শিবনারায়ণ আরাম। তুফতা তাকে পাঠিয়েছে আগ্রায় ছাপাখানা আছে আরামের। নতুন কাজে তার খুব উৎসাহ। গালিবের একটি বই ছাপতে পারবে জেনে তার খুশির সীমা নেই।

গালিবের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে আছে আরাম। ঘরে ঢুকেই পায়ে হাত দিয়ে সালাম করেছে। গালিব খুশি হয়ে বললেন, আমার বই ছাপানোর জন্য তুফতা তোমাকে আসতে বলেছে? বাহ, বাহ খুবই খুশির খবর। আর তুমি তো সুদর্শন যুবক। বয়সও বেশি নয়। কী করো তুমি?

আমার ছাপাখানা থেকে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করি।

বাহ বেশ তো।

আমি আপনার জন্য এক প্যাকেট খাস উপহার এনেছি।

www.BanglaBook.org

খাম এনেছ ? আমার চিঠি পাঠানোর খাম আমি নিজেই বানাতে ভালোবাসি। আমি বানাইও।

এখন থেকে আপনি এই খাম ব্যবহার করবেন।

ঠিক আছে রাখো।

তাহলে আমার প্রেসেই আপনার দিনলিপি ছাপা হবে।

তুমি কাল আসো। আমি সবকিছু ভেবে ঠিকঠাক করব।

আরাম চলে যায়।

গালিব দস্তাম্বু'র পৃষ্ঠা গোছাতে বসেন। পৃষ্ঠা সংখ্যা ঠিক করেন। প্রতি পাতায় গাঢ় গালি দিয়ে সংখ্যা লেখেন। আরাম যেন ভুল না করে।

গতকাল ইন্দোরের উম্মীদ সিং বাহাদুরের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছেন। তিনি তাঁর পঞ্চাশ কপি বইয়ের দাম দিতে রাজি হয়েছেন। তিনি তাঁকে বলেছেন তুফতার সঙ্গে যোগাযোগ করতে মন খুশি হয়ে যায়। বেশ সুখবর পাচ্ছেন। 'দস্তাম্বু' ছাপা হলে ইংরেজদের হাতে তুলে দেবেন। যত দূর সম্ভব তত তাড়াতাড়ি। তাহলেই তাঁর ওপর থেকে সন্দেহ কাটবে। পেনশন পাবেন। মনের খুশিতে পাণ্ডুলিপির কাজ শেষ করলেন।

পরদিন আরাম এল।

গালিব হেসে বললেন, তোমার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য আমার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত।

শুকরিয়া মির্জা নওশা সাহেব।

আরামের সপ্রতিভ ভঙ্গিতে গালিব খানিকটুকু চমকিত হন। বেশ চটপটে ছেলে তো! সময়মতো বইটি শেষ করে দিতে পারবে।

আগ্রায় তোমার বাড়ি কোথায় ? তোমার আব্বার নাম কী ?

আরাম মুখে হাসি ছড়িয়ে বলে, আমার দাদাজান আপনার ছেলেবেলার বন্ধু। দাদাজানের কাছে আপনার অনেক গল্প শুনেছি।

বন্ধু! আমার একজন প্রিয় বন্ধু আছে। নাম কি তোমার দাদাজানের ?

বংশীধর।

বংশী! বংশী তোমার দাদাজান। আহ কী শান্তি। তাহলে তুমিও আমার নাতি।

শুকরিয়া মির্জা নওশা সাহেব।

গালিব থমকে গিয়ে বলে, মির্জা নওশা! এটা আমার ডাক নাম।

আমি দাদাজানের কাছে এই নাম বেশি শুনেছি।

তা শুনতে পারো। কিন্তু আমার বইয়ের নাম হবে আসাদুল্লা খান গালিব। ঠিক আছে ?

জ্বি, ঠিক আছে।

তুমি কাছ শুরু করো। দরকার হলে আমি নির্দেশ দেব। তুফতা আর মৌলানা মিহরকেও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেব। মনে রেখো একটি আরবি শব্দ থাকলেও সেটি বদল করতে হবে। ফারসি শব্দ ঢোকাতে হবে।

জি আচ্ছা। আপনার নির্দেশমতো কাজ হবে।

বইটির ব্যাপারে আমি খুব উদ্গ্রীব। বইটির ওপরে আমার ভবিষ্যতের অনেক কিছু নির্ভর করছে।

জ্বি আচ্ছা।

এই বইয়ের প্রতিটি শব্দের সঙ্গে আমার রক্তবিন্দু মিশে আছে আরাম। তুমি বুঝবে না যে বইটি ছাপার ব্যাপারে আমি কতটা উদ্বিগ্ন।

আমি আপনার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। কোনো ভুল হবে না। আপনি আমাকে ভরসা করতে পারেন।

খুব খুশি হলাম তোমার কথা শুনে।

আমি তাহলে আজকে যাই মির্জা নওশা সাহেব।

আচ্ছা। খোদা হাফেজ।

ও বেরিয়ে যাবার পরে গালিব খানিকটা আতঙ্কিত হলেন। ছেলেটি বইয়ে আবার মির্জা নওশা নাম ছাপিয়ে না দেয় ? তুফতাকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য চিঠি লিখতে বসলেন। মৌলানা মিহরকেও লিখবেন ভাবলেন।

পরদিন বিকেলে আলতফ এলেন দেখা করতে।

কেমন আছেন ওস্তাদ ?

এমন একটি প্রশ্ন না করলেই আমি খুশি হই বন্ধু।

আপনি কি জানেন রামপুরের নওয়াব ইউসুফ খান চেষ্টা করছেন ইংরেজদের সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তালিকা থেকে আপনার নামটি বাদ দিতে ?

হ্যাঁ, আমি তা শুনেছি। আমি তো তাতার জন্য তাঁর কাছে আবেদন করেছিলাম।

শোনা যাচ্ছে ইংরেজরা আপনার পেনশন ছেড়ে দেবে। ওটা আর আটকে রাখা হবে না।

গালিব ভুরু কুঁচকে আলতফের দিকে তাকান। কথা বলেন না। এটা তাঁর জন্য একটি বড় খুশির খবর হতে পারত, কিন্তু কোথায় যেন কাঁটা আছে। কাঁটা ফুটে রক্ত ঝরছে হৃৎপিণ্ড থেকে।

আলতফ দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বলেন, প্রভুরা যদি সহৃদয় হন তা হলে তো আমি ধন্য হব। আমার পরিবার বেঁচে যাবে।

আপনি কার ওপর রাগ করছেন ?

নিজের ভাগ্যের ওপর।

ভাগ্য! আলতফ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকান।

ভাগ্যই তো। আমি এখন স্বাধীন হতে চাই বন্ধু। আমি স্বাধীনতার খোঁজ করছি।

স্বাধীনতা ? আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

ভাবছি আমি একা হয়ে গেলে আমি বোধ হয় অনেক স্বাধীন হয়ে যেতে পারতাম।

একা হয়ে যাবেন ?

লোহারুর নওয়াব আমিন উদ্দিনের ছেলে আলাউদ্দিন খানকে তো তুমি চেনো ?

হ্যাঁ চিনি। আপনার স্ত্রীর ভাইয়ের ছেলে।

তাকে আমি একটা চিঠি লিখেছি।

আলতফ হাসতে হাসতে বলেন, চিঠি লেখা আপনার নেশা। অনবরত চিঠি লেখেন।

চিঠিই তো যোগাযোগ। চিঠি ছাড়া তো যোগাযোগের উপায় নেই।

তা ঠিক। তবে সবাই চিঠি লিখতে পারে না। এই আমিই তো আপনার মতো এত চিঠি লিখতে পারি না।

হালী তুমি কি আমার সমালোচনা করছ ?

না ওস্তাদ, আমি আপনার ধৈর্যের প্রশংসা করছি। আপনি আলাইকে কী লিখেছেন চিঠিতে ?

লিখেছি আলাই যেন তার ফুপু ও নাতি দুজনকে তাদের কাছে নিয়ে যায়।

মানে ? আলতফ সোজা হয়ে বসে।

মানে তো সোজা। বলেছি, ওরা যেন ওদের জ্ঞাতিগুষ্টিকে নিজেদের কাছে নিয়ে যায়। তাহলে আমি ওদের হাত থেকে মুক্তি পাই।

মুক্তি ? আলতফ ঢোক গেলে।

ওহ্, হালী তুমি কি শব্দ বুঝতে পারো না ? আমাকে বারবার প্রশ্ন করছ কেন ?

ঠিকই বলেছেন, আমি অনেক কিছু বুঝতে পারছি না। আমার অনেক শব্দ অচেনা মনে হচ্ছে।

তাই তো আমিও ভাবছি। তোমাকে কেমন বোকার মতো লাগছে।

আচ্ছা আমি আর প্রশ্ন করব না। আপনি চিঠির কথা বলুন।

আমি আলাইর দাদি, আব্বা এবং চাচাকে জানিয়ে দিয়েছি যে তাঁদের কাছ থেকে আমি কী চাই।

অবশ্য যদি আমার বিবি ও নাতিরা লোহারু যেতে রাজি থাকে তাহলেই তারা কাজটি করতে পারে। ওদের আত্মীয়কে ওরা নিজেদের কাছে নিয়ে যাবে। এই আর কী!

আপনি কী করবেন ?

আমি কারও দায় না টেনে স্বাধীন হব। পেনশন যদি আবার পাওয়া যায় তাহলে তা

www.BanglaBook.org

শুধু নিজের জন্য খরচ করব। আর কাউকে ভাগ বসাতে দিতে চাই না।

তারপর কী করবেন?

অন্য কোথাও চলে যাব। যেখানে ভালো লাগবে সেখানে গিয়ে থাকব। সেখানে থাকতে ভালো না লাগলে অন্য কোথাও চলে যাব। এভাবে বাকি দিন কয়েকটা শেষ করে দিতে চাই।

আলতফ মৃদু হেসে বলে, আপনার পেনশন চালু হলেও আপনি কোথাও গিয়ে থাকতে পারবেন না।

পারব। পারতেই হবে আমাকে। এই শহর আমার আর ভালো লাগছে না। শহরটা আর শহর নেই।

শহরটা গোল্লায় গেলেও আপনি দিল্লিতেই থাকবেন। এই শহর ছেড়ে চলে যাওয়া আপনার হবে না। আপনি পারবেন না।

পারবেন না?

এই পঞ্চাশ বছরে যখন পারেন নি তখন আর পারবেন কবে?

হয়ত তুমি ঠিকই বলেছ হালী।

আপনার পরিবারকেও আপনি কারও ঘাড়ে তুলে দিতে পারবেন না ওস্তাদ। এত কষ্টের মধ্যেও আপনি গুমনকে বাড়িতে জায়গা দিয়েছেন।

বড় কষ্ট হচ্ছে হালী।

গালিব বিষণ্ণ ম্রিয়মাণ কণ্ঠে বলেন।

সেই কণ্ঠস্বর আলতফের বুক ভারি করে দেয়। জোর দিয়ে বলেন, নওয়াব ইউসুফ খান আপনার পেনশনের ব্যাপারে একটা কিছু করেই ছাড়বেন।

আল্লাহ মালুম।

তারপর তিনি উঠে গিয়ে টেবিল থেকে একটুকরো কাগজ টেনে এনে বলেন, দিল্লির কথা কী লিখেছি একটু পড়ব?

হ্যাঁ, আমি শুনব। আপনি পড়ুন।

গালিব কাগজটা চোখের কাছে উঠিয়ে উঁচু করে ধরে পড়তে শুরু করেন—একসময় দিল্লি বলতে বোঝাত লালকেল্লা, চাঁদনি চক, জামে মসজিদের কাছে মাছের বাজার, যমুনা নদীর সেতুর ওপর ঘুরে বেড়ানো, ফুল ব্যাপারীদের বছরে একবার ফুলের মেলা। এখন এর কোনো কিছু অবশিষ্ট নেই। এসব ছাড়া কি আমি দিল্লির কথা ভাবতে পারি? কোথায় সেই দিল্লি এখন? আমি যা বর্ণনা করেছি একসময় দিল্লি বলতে তাই বোঝাত।

গালিব থামলে আলতফ বললেন, সঠিক বর্ণনা। যারা দিল্লিকে ভালোবাসে তাদের সবারই এখন চোখে পানি। প্রিয় শহরের মরণদশা কেই বা সহ্য করতে পারে!

এ ছাড়াও অনেক কষ্ট আছে।

গালিব রুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, বড় অসহায় হয়ে যাই, বড় ক্ষুদ্র হয়ে যাই যখন দেখি অভিজাত ঘরের নারী ও মেয়েরা বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করছে। ওদের অবস্থা দেখলে হৃদয় পাষাণ হয়ে যায়। এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখার চেয়ে মৃত্যুই ভালো ছিল হালী।

তিনি দু'হাতে চোখের জল মোছেন। মাথা নিচু হয়ে যায় আলতফেরও।

উঠে গিয়ে আরেকটি কাগজ এনে বলেন, এটা পড়ব এখন।

আলতফ কিছু না বলে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকেন। গালিব চোখের পানি মুছে পড়েন– দিন তো আমার প্রায় শেষ হয়েই এল। কতদিনই বা আর বাকি! এরপর সৃষ্টিকর্তার কাছে চলে যাব। সেখানে ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শীত-গ্রীষ্ম কোনো কিছুই বুঝতে হবে না। সেখানে কোনো শাসককে ভয় পেতে হবে না—বলা যায় সে এক আলোর দুনিয়া—খাঁটি আনন্দের জায়গা। ওই জায়গার সঙ্গে অন্য কোথাওর তুলনা চলে না। ওই আনন্দে জীবনের সবচেয়ে শুদ্ধতম আনন্দ।

বাহ্ চমৎকার লিখেছেন।

আলতফ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে।

আমার মনে হচ্ছে আপনি একটি চমৎকার গজল লিখেছেন। মনে হয় এখনই দু'চোখ বুজে যাক। চলে যেতে চাই আপনার ধারণার শুদ্ধতম আনন্দের স্থানে।

বন্ধু বড় শান্তি দিলে। তোমার মুখে এই কয়টি বাক্য শুনে আমি ধন্য হয়ে গেলাম।

ওস্তাদজি অনেক সময় আপনাকে আমরা তাড়াতাড়ি বুঝতে পারি না। বুঝতে সময় লাগে।

গালিব হাসতে হাসতে বলেন, কখনো আবার খোঁজার জন্য নিজেরা যুক্তি খুঁজে নাও। তাই না? ঠিক বলেছি?

একদম ঠিক বলেছেন। আমরা আপনাকে ভালোবাসি ওস্তাদজি। আপনি আমাদের প্রিয় মানুষ।

আমার শত্রুও অনেক।

শত্রুজনকে মাফ করতে হবে।

গালিব মাথা নেড়ে চুপ করে থেকে বলেন, আমি তো ফেরেশতা নই।

আপনি কবি। আপনার কবিতা আছে। আপনাকে আশ্রয় দেয় কবিতা। কবিতা আপনাকে তার বুকে ধারণ করে। মুছে দেয় আপনার যন্ত্রণা।

হ্যাঁ, তা করে কবিতার জন্যই আমার বেঁচে থাকা। দিল্লি শহরে চিৎকার করে অনবরত বলতে চাই, আমি কবি। দেখো আমাকে। গালিব দু'হাতে মুখ ঢাকেন। আলতফ বিদায় নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করেন। তিনি বুঝতে পারেন কবি দু'হাতের তালু নিজের চোখের জলে ভিজিয়ে দিচ্ছেন। ভিক্ষুক হাতের তালু। ভিক্ষুক শুকনো দিন। কাঙ্ক্ষিত বর্ষণে ভরে উঠুক কবির শস্যক্ষেত্র।

'দস্তাম্বু' ছাপার কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে।

তুফতা ও মৌলানা মিহরকে অনবরত নির্দেশ দিয়েছেন। সবকিছুই ঠিকঠাকমতো হচ্ছে। তাঁর আগের প্রকাশিত বইগুলোর চেয়ে এই বইয়ের ব্যাপারে তিনি অনেক বেশি সংবেদনশীল। অনেক বেশি মনোযোগী। প্রবল অস্থিরতায় তাঁর দিন কাটছে।

এর মধ্যে তুফতার চিঠি পেলেন।

তুফতা লিখেছে, 'দস্তাম্বু' ছাপানোর কাজ করতে করতে ওর আর আরামের মনে হয়েছে তাঁর একটি উর্দু চিঠির সংকলন প্রকাশ করা যেতে পারে।

গালিব চিঠিটি কয়েকবার পড়লেন। শেষে ঠিক করলেন এই চিঠির সংকলন ছাপা ঠিক হবে না। তুফতাকে লিখলেন: অনেক ভেবে দেখেছি তোমার প্রস্তাবটিতে সায় দেওয়া ঠিক হবে না। চিঠিগুলো খুব যে যত্ন করে লিখেছি তা নয়। বেশির ভাগ চিঠিই অযত্নে অবহেলায় লেখা। চিঠিগুলোতে যত্নের ছাপ নেই। চিঠিগুলো সেভাবে লেখা নয় যার দ্বারা একজন কবিকে বুঝতে পারবে কেউ। আমার মনে হয় চিঠিগুলো ছাপা হলে আমার সুনাম ক্ষুণ্ন হবে। তবে ফারসি ভাষায় লেখা আমার চিঠিগুলো অন্যরকম। এই চিঠিগুলো নিয়ে আমি গর্ব করতে পারি। লাইব্রেরি লুট হওয়ার ফলে আমার কোনো বইয়ের পাণ্ডুলিপি আর নেই। আমি সবাইকে বলেছি কোথাও আমার বই পেলে কিনে রাখতে। এভাবে আমার হারানো বই সংগ্রহ করতে হবে। ফারসি দীওয়ান, উর্দু দীওয়ান, পনজ আহঙ্গ, সিহর-ই-নিমরোজ বইয়ের পাণ্ডুলিপি আমার খুব দরকার। এগুলো না পেলে আমি বুঝি পাগলই হয়ে যাব বন্ধু।

এই চিঠিটি ডাকে পাঠানোর দুদিন পরে আগ্রা থেকে আরামের চিঠি পান। ও লিখেছে, 'পনজ আহঙ্গ'-এর একটি কপি পেয়েছে।

চিঠিটি পড়ে তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। চিঠির গায়ে চুমু দিলেন। একজন কবির জীবনে এর চেয়ে বড় স্বস্তি আর কী হতে পারে! এর আগে 'পনজ আহঙ্গ' দুবার ছাপা হয়েছিল। ছাপা দেখে তিনি খুশি ছিলেন না।

তিনি সঙ্গে সঙ্গে আরামকে চিঠি লিখলেন: খোদার অশেষ মেহেরবানী যে তুমি আমার বইটি পেয়েছ। আমার বিশ্বাস তোমার হাতে বইটি এবার সুন্দরভাবে ছাপা হবে। তুমি লিখেছ, সিহর-ই-নিমরোজ

www.BanglaBook.org

ছাপতে চাও। এ বইটি এখনই ছাপার দরকার নেই। আমার এখন একটি সংকট মুহূর্ত চলছে। আমার পেনশনের জন্য এখন দরকার ব্রিটিশদের সহযোগিতা। এই সময়ে যুগল বাদশার জীবনকাহিনী ছাপলে ক্ষতি হবে। বুঝতেই পারো যে হিতে বিপরীত হবে।

চিঠি খামে ভরতে ভরতে নিজেকেই শোনালেন নিজের শের:

'দর্দ মিন্নত কশ্-এ-দবান হুয়া
ম্যায় ন অচ্ছা হুয়া বুরা ন হুয়া।
যন্ত্রণায় ওষুধে কিছু হলো না,
আমি ভালো হলাম না, খারাপও হলাম না।'

কাল্লু মিয়া ঘরে ঢুকে বলল, হুজুর রামপুরার নওয়াবের কাছ থেকে আপনার কাছে লোক এসেছে।

গালিব ভুরু কুঁচকালেন, নওয়াব ইউসুফ আলী খান ? তবে কি পেনশনের ব্যাপারে কোনো খবর ? ...

কাল্লু মিয়া ওকে এখানে নিয়ে এসো।

তিনি একরকম হাঁক দিয়েই বললেন, যেন বড় কিছু ঘোষণা করার মতো খবর ঘটতে যাচ্ছে একটু পরে।

রামপুরের নওয়াব ঘরে ঢোকে। হাতে গালা দিয়ে লাগানো লেফাফা। চিঠিটি গালিবের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন, নওয়াব বাহাদুরের অফিস থেকে এই চিঠি আপনাকে পাঠিয়েছে হুজুর।

শুকরিয়া। দিন।

লোকটি চিঠি দিয়ে চলে যায়। কাল্লু মিয়ার কাছ থেকে চিঠির খবর শুনে দরজার বাইরে জড়ো হয়েছে বাড়ির কাজের লোকেরা। প্রত্যেকে খবরটা শোনার জন্য উদগ্রীব।

গালিব চিঠি খুলে পড়লেন। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। তাঁর মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

দরজার আড়ালে থেকে ঘরে ঢোকে গৃহকর্মীরা।

হুজুর কোনো খবর আছে ? ভালো খবর ?

হুজুর আমাদের বেঁচে যাওয়ার খবর আছে ?

হুজুর-হুজুর-হুজুর-

গালিব চমকে সবার দিকে তাকান। একটি দুটি নয়, মনে হয় তার কানে শত শত কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হচ্ছে। তিনি ওদের দিকে তাকিয়ে দ্রুতকণ্ঠে বলেন, হ্যাঁ, আছে, আছে।

কী খবর হুজুর ?

প্রত্যেকে ঘরে ঢুকে ঘিরে ধরে তাঁকে।

রামপুরের নওয়াব আমাকে প্রতি মাসে একশ টাকা করে ভাতা দেবে।

শোকর আলহামদুলিল্লাহ।

আল্লাহ আমাদের দিকে মুখ তুলে চেয়েছে। যাই সবাইকে খবর দেই।

হুড়মুড়িয়ে চলে যায় লোকেরা।

একটু পরে দুই নাতিসহ আসেন উমরাও জান। হাসিমুখে বলেন, আপনার ভাতা পাওয়ার সুখবরে বাড়ির লোকের দুশ্চিন্তা কেটে গেছে। ওরা আনন্দে মেতেছে।

আমিও ওদের হাসি-আনন্দ শুনতে পাচ্ছি বিবি।

নানাজান আমরাও খুব খুশি হয়েছি। আমাদেরকে মিঠাই কিনে দিতে হবে।

হুসেন গালিবের কোলে বসে।

নানাজান আমাকে খেলনা কিনে দিতে হবে।

সব হবে তোমরা শান্ত হও।

দুই ভাই আশ্বস্ত হয়ে দৌড়ে বাইরে চলে যায়।

গালিব মৃদু হেসে বলেন, তোমার কিছু চাওয়ার নাই বিবি ?

আছে। আমি আমার আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে যাব। কুতুব সাহিবে লোহারু পরিবারের অনেকে থাকে। এতদিন অভাবের যন্ত্রণায় তাদের সঙ্গে দেখা করতে পারি নি। পারব তো যেতে ?

হ্যাঁ, পারবে। পারবে না কেন ? তবে আমার দুঃখ একটাই। কুতুব সাহিবের কত বাড়িঘর ভেঙে ফেলা হচ্ছে। নতুন করে গড়া হচ্ছে দিল্লি।

এটাই আমাদের দুঃখ।

দুঃখ আর কী বিবি! মাঝে মাঝে মনে হয় আমি খুশিই হচ্ছি যে দিল্লি শহরকে ভেঙে চুরমার করা হচ্ছে।

খুশি ? খুশি হচ্ছেন ? উমরাও জানের কণ্ঠে আতঙ্ক।

গালিব দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, এখানকার কত মানুষ কত দিকে চলে গেল। শহরের অধিবাসীরাই যখন চলে গেছে, তখন শহর থেকে লাভ কী ? ইট-পাথর দিয়ে তো শহর হয় না। মানুষ নিয়ে শহর। ভেবে দেখো বিবি কতদিন মুশায়রায় বসি না। বসব কার সঙ্গে ? এখন তো কবিতার সমঝদার নাই। আছে শহরের কারিগররা। আছে ব্রিটিশ আর পাঞ্জাবিরা। আছে হিন্দুরা। মুশায়রায় বসার জন্য কেউ নাই।

থাক, দুঃখ করবেন না। খুশি হন যে মাসিক ভাতা পেয়েছেন। খুশি হন যে আর অল্পদিনে আপনার বই ছাপা শেষ হয়ে যাবে।

শুকরিয়া বিবি। তোমার কথা শুনে খুশি হয়েছি।

সেদিন সন্ধ্যায় এক বোতল মদ নিয়ে মহেশ দাস আসে।

বাহ, বাহ আজ আমার চারদিকে খুশির পেয়ালা। পেয়ালাভরা খুশি আমি পান করে চলেছি।

আপনার ভৃত্যকে পেয়ালা আনতে বলুন।

কাল্লু মিয়াকে ডাকতে হয় না। মহেশ দাসের হাতে বোতল দেখে পেয়ালা ও গোলাপ জল নিয়ে হাজির হয় ও। গালিব খুশি হয়ে বলেন, আমার পোড়া বুকটাকে ও দেখতে পায় মহেশ।

হ্যাঁ, তাইতো দেখতে পাচ্ছি। ও আপনার যোগ্য সাগরেদ।

কাল্লু মিয়া মদ আর গোলাপ জল মিশিয়ে পেয়ালা গালিবের হাতে তুলে দেয়। তিনি তৃষ্ণার্ত চাতকের মতো পেয়ালায় চুমুক দেন। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকান মহেশ দাসের দিকে।

আপনি শুনেছেন তো আমার নতুন বই ছাপার কাজ হচ্ছে।

হ্যাঁ, শুনেছি। আপনার শরীর ভালো আছে তো ?

না, শরীর তো এখন আর ভালো থাকে না। সেই যে দিল্লি সোরে ভুগলাম। তারপর থেকে শরীর আর ভালো হলো না। কী ভোগাটা যে ভুগেছিলাম। তখন তো আপনি আমাকে দেখেন নি।

মহেশ লজ্জিত ভঙ্গিতে বললেন, হ্যাঁ, তখন আপনার কাছে আসতে পারি নি। শহরের যা অবস্থা ছিল।

এখনই কি শহর ঠিক হয়েছে ? আমি বেঁচে থাকতে এই শহর আর ঠিক হবে না। শহরের ভালো দিন আমার দেখা হবে না।

আপনি হয়তো জানেন না যে দিল্লিতে একটি নতুন প্রথা চালু হয়েছে।

নতুন প্রথা ? সেটা কী ?

টাউন ডিউটি মানে শহর কর চালু করা হয়েছে।

টাউন ডিউটি! গালিব কিছু একটা মনে করার চেষ্টা করে বললেন, কাল্লু আমাকে পাউন টুটি না কী যেন বলছিল।

মহেশ দাস হেসে বললেন, লোকের মুখে মুখে টাউন ডিউটি পাউন টুটি হয়ে গেছে।

শব্দ যাই হোক বিষয়টি কী ?

ইংরেজরা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা করেছে। যে কোনো মালামাল শহরে আনতে হলে শুল্ক দিতে হবে। অবশ্য এর মধ্যে খাদ্যশস্য আর গোবর বাদ।

গালিব পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললেন, ও আচ্ছা। শুল্ক আদায়ের দায়িত্ব দিয়েছে কাদের ?

আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

গালিব চোখ বড় করে তাকালে মহেশ দাস সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আমার সঙ্গে পালিগ রাম ও চুন্নাপাল। পাঞ্জাব থেকে বড় বড় অফিসার এসে এ নিয়ে মিটিং করেছে।

www.BanglaBook.org

গালিব এবারও কথা বললেন না। আবারও পেয়ালায় চুমুক দিলেন। তারপর বললেন, শহরে লোকার ব্যাপারে তো খুবই কড়াকড়ি করা হয়েছে। সৈনিকরা তো শহর পাহারা দিচ্ছে, তারপরেও পুলিশ অফিসার মোতায়েন করা হয়েছে। তাই না?

হ্যাঁ, ঠিকই। পুলিশ অফিসার লাহোর গেটে চেয়ার নিয়ে বসে থাকেন। যদি কোনো লোক সৈনিকের চোখ ফাঁকি দিয়ে শহরে ঢোকার চেষ্টা করে, তাকে ধরে দফতরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

গালিব মহেশ দাসের কথা টেনে নিয়ে বলেন, শুনেছি যাদেরকে ধরা হয় তাদেরকে দু টাকা জরিমানা করা হয়। তা না হলে তাদেরকে কমিশনারের আদেশে পাঁচ ঘা বেত মারা হয়।

মহেশ দাস মাথা নাড়েন।

গালিব পেয়ালা রেখে বলেন, তারপরও তাদেরকে আটদিন জেলে রাখা হয়। আরও কঠিন কথা হলো যে পারমিট ছাড়া যারা শহরে বাস করছে তাদের খুঁজে বের করার জন্য সব থানায় আদেশ দেওয়া হয়েছে।

মহেশ দাস বিব্রত কণ্ঠে বলে, আপনি সব জানেন দেখছি।

জানব না, আমাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করতে পুলিশ ইনস্পেক্টর এসেছিল।

আপনি কী বলেছেন?

আমি কী বলেছি তা আমার কাছে লেখা আছে। বয়স হয়েছে। পরে ভুলে যেতে পারি এই ভয়ে লিখে রেখেছি। পড়ে শোনাই।

হ্যাঁ, আমি শুনব।

মহেশ দাস আগ্রহ নিয়ে বলে।

গালিব টেবিলের ওপর থেকে কাগজটা টেনে বের করে, পড়েন- আমি পুলিশ ইনস্পেক্টরকে বলেছি, আপনার তালিকায় আমার নাম লিখবেন না। আলাদা একটি কাগজে লিখুন। এভাবে লিখুন যে, পেনশনার আসাদুল্লা খান ১৮৫০ সাল থেকে পাতিয়ালার মহারাজার ভাইয়ের বাড়িতে বসবাস করছেন। সিপাহীদের বিদ্রোহের পরে তিনি এই বাড়ি থেকে বের হন নি।

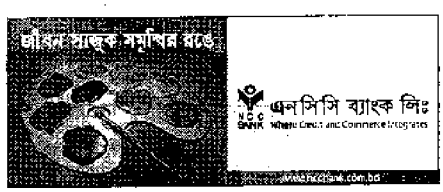

www.BanglaBook.org

ইংরেজরা শহর দখল করার পরও তিনি বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও যান নি। অবশ্য এটাও ঠিক তাকে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য করা হয় নি। কর্নেল ব্রাউন সাহেব তাঁকে এই বাড়িতে থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন। সেই আদেশ এখন পর্যন্ত কেউ বাতিল করেন নি। এখন কর্তৃপক্ষ যা ঠিক করেন তাই পালন করা হবে।

পড়া শেষ করে গালিব কাগজটা ভাঁজ করে আবার টেবিলে রাখেন। বলেন, আমি যা বলেছি ইনস্পেক্টর তা লিখে নিয়েছেন।

এরপর তো আর কিছু হয় নি?

না। তবে পরস্পরের কাছ থেকে শুনেছি মহল্লার লোকদের তালিকার সঙ্গে আমার আবেদন পুলিশের বড় কর্তার কাছে পেশ করা হয়েছে।

আমার মনে হয় আর কিছু ঘটবে না।

না ঘটলেই ভালো। বুড়ো বয়সে নতুন ঝামেলা আর সহ্য হয় না।

একজন কবির মুখে এসব শুনলে আমাদের কষ্ট হয়। কবি তো আমাদের প্রাণের কথা লেখেন।

গালিব মৃদু হেসে পেয়ালাটা উঁচু করে ধরে বলেন, হোক দেশীয় মদ, তারপরও এটুকুতেও কবির বেঁচে থাকা সহজ হয়। কটি প্রাণ ফিরে পায়।

একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন, শহরের আর কোনো খবর আছে?

আপনি হয় তো শুনেছেন যে সাধারণ মানুষের জন্য দিল্লির গেট খুলে দেওয়া হয়েছে।

না, শুনি নি তো। কাদেরকে আসতে দেওয়া হচ্ছে?

যাদের শহরে বাড়ি আছে তাদেরকে ঢোকার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তবে শহরের অনেক দিনের পুরনো বাসিন্দা, কিন্তু নিজের বাড়ি নেই, ভাড়া বাড়িতে বাস করে এমন লোকদেরও শহরে আসার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

হাকিম আহসানউল্লাহ খানের কোনো খবর আছে? তিনি কি আসতে পেরেছেন?

হ্যাঁ, তিনি আসতে পেরেছেন।

আমি তো জানি সিপাহীরা তাঁর বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। তিনি কোথায় আছেন?

তাঁর সবচেয়ে ভালো বাড়িটি ভেঙে ফেলেছে সিপাহীরা। তাঁর তো আরও কয়েকটি বাড়ি আছে। তিনি তার একটিতে বাস করছেন।

সবই নসিব।

গালিব আবার পেয়ালা হাতে তুলে নেন। বুঝতে পারেন নেশা জমে উঠেছে। তারপরও খুব বিষণ্ণ কণ্ঠে বলেন, আহসানউল্লাহ কেমন আছেন? তবীয়ত ঠিক আছে তো?

তিনি গৃহবন্দি অবস্থায় আছেন। বাড়ি থেকে বের হওয়া নিষেধ। এমনকি শহর ছেড়েও তিনি বের হতে পারবেন না।

গালিব হা-হা করে হেসে উঠলেন। পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে বললেন, যার বাড়ি সিপাহীরা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করল, তাকেই ইংরেজরা গৃহবন্দি করল। হাঃ, নসিব আপনা আপনা।

তিনি মহেশের মুখের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলেন। বলেন, মুসলমানদের ঘরে ফেরার হুকুম তো এখনো হয় নি? না?

হয় নি। আমি তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য খুব চেষ্টা করছি। তবে শুনতে পাচ্ছি পয়লা জানুয়ারি থেকে সবাইকে ঘরে ফেরার অনুমতি দেওয়া হবে। যাঁরা পেনশন পান তাঁদের বকেয়া টাকাও দিয়ে দেওয়া হবে। দেখা থাক কী হয়?

তাহলে তো আমি আশায় থাকতে পারি। দেখা যাক নতুন বছর আমার জন্য কী সুসংবাদ বয়ে নিয়ে আসে। মানুষকে তো আশায় আশায় থাকতেই হয়।

'দস্তাম্বু' ছাপার কাজ শেষ হয়েছে।

বিভিন্ন জায়গায় বই পাঠাচ্ছেন গালিব। প্রভাবশালী ইংরেজদের কাছে পাঠানো হয়েছে। কেউই বাদ পড়েছে বলে গালিব মনে করেন না। মনে ক্ষীণ আশা এই যাত্রা হয় তো পেনশন যুক্ত হতে পারে।

তুফতা চিঠি পাঠিয়েছেন।

লিখেছেন, ইন্দোরের রাজা উদীন সিং তার পুরো ঠিকানা জানতে চেয়েছেন।

গালিব চিঠিটা দুবার পড়ে তুফতাকে লিখতে বসলেন, বন্ধু যে কবিকে সবাই চেনে তাঁর মহল্লা লেখার দরকার হয় না। বিষয়টি তোমার চেয়ে ভালো আর কে জানে? ফারসি ও ইংরেজিতে লেখা সব চিঠি আমার কাছে অনায়াসে চলে আসে। আমি একজন দীন ব্যক্তি হলেও ডাক বিভাগের লোকদের চোখের আড়ালে থাকি না। বন্ধু, এমনটাও দেখেছি যে, কোনো কোনো ফারসি চিঠিতে মহল্লার নাম লেখা থাকে না, আর ইংরেজি চিঠিগুলোয় তো শুধু দিল্লি লেখা থাকে। তারপরও চিঠি হারায় না।

চিঠির নিচে তুফতাকে লিখে দিলেন নিজের শের:

'এমন কে আছে, যে গালিবকে না জানে?
কবি তো সে ভালোই, তবে তার বদনাম খুব।'

পরদিন খবর পেলেন মহারানি ভিক্টোরিয়ার প্রকাশ্য ঘোষণা অনুযায়ী ভারত শাসনের দায়িত্ব নিয়েছে ব্রিটিশরাজ।

মহল্লার গলিতে লোকজন বেরিয়ে এসে আলাপ-আলোচনায় মেতে উঠেছে। গালিব নিজে গিয়েও সবার সঙ্গে দাঁড়ালেন।

একজন বলে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তুলে দেওয়া হয়েছে।

অন্যজন বলে, ইংরেজদের হত্যাকাণ্ডে যারা সরাসরি অংশ গ্রহণ করে নি এমন বিদ্রোহী সামন্তদের এই ঘোষণার সাধারণ ক্ষমা করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

এসব কথা শুনে গালিব বেশ স্বস্তিবোধ করতে লাগলেন। ইংরেজদের অত্যাচারে বন্ধুহীন হয়ে গেছে শহর। বড় একা, বড় নিঃসঙ্গ জীবন এখন তার। যে দু-চারজনের দেখা পান তাতে মনের তিয়াস মেটে না।

তাঁর ভাবনার মাঝে অন্যজন বলেন, এই ঘোষণায় ভারতীয় সামন্তদের জায়গীরের অধিকার নিশ্চিত করা হবে বলে বলা হয়েছে।

কেউ একজন বড় গলায় বলল, সামন্তপ্রভুরা স্বার্থরক্ষার আশ্বাস পেয়েছে। এখন তারা নিজেদেরকে বিদ্রোহ থেকে গুটিয়ে ফেলবে।

বিদ্রোহের আগুন তো কমবেশি নিভেই গেছে। এখন আগুনের শেষ শিখাটুকুও আর থাকবে না।

একজন সবাইকে থামিয়ে দিয়ে গম্ভীর গলায় সতর্ক ভঙ্গিতে বলল, ইংরেজদের ষোলোকলা পূর্ণ হয়েছে। এবার ওরা ভারতবর্ষকে পরাধীন রাখার কাজে মন দেবে। ওদের সামনে আর কোনো বাধা নেই। ওদের পুরোনো কাজে যে ভুল ছিল তার সংশোধন করবে। নতুন নীতি বানাবে। হা-হা ওদের দুয়ার খুলে গেছে।

আহ্, থামুন।

কেউ একজন চাপা কণ্ঠে বলে।

স্তব্ধ হয়ে যায় মহল্লার গলিতে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন মানুষ।

তাদের মাঝে গালিব একজন।

তাঁর বুকের ভেতর তোলপাড় করে। বারবারই মনে হয় অনেক দেখা হলো। আর কয়দিনই বা বাঁচবেন? তিনি ধীর পায়ে ঘরে ফেরেন। ঘরে ফিরতে থাকে অন্যরা। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলে না। যেন মহারানির একটি ঘোষণায় হতচকিত বিহ্বল মানুষেরা। গুটিয়ে থাকার জন্য ঘরের ভেতর আশ্রয় নিচ্ছে। ঘরের ভেতরে পা রাখার আগে গালিব ঘাড় ঘুরিয়ে গলির দিকে তাকালেন। একজন মানুষও রাস্তায় নেই। খাঁ-খাঁ করছে ছোট রাস্তাটি। মানুষেরা কোথায় লুকাবে? লুকোলেই কি রক্ষা পাবে তারা? এই শহরেরই বা কী হবে? শহরটাকে তো বদলে দিচ্ছে ইংরেজরা। ভেঙে ফেলছে পুরোনো আদল, গড়ছে নতুন করে। নিজেদের পছন্দমতো। প্রিয় শহরটা বদলে আছে ভিনদেশী মানুষের হাতে।

তিনি ঘরে ঢুকে চুপচাপ বসে থাকেন। আগ্রা থেকে আরামের চিঠি পেয়েছেন। ওর

www.BanglaBook.org

সংবাদপত্র আফতাব-ই-আলমতাব-এর জন্য কয়েকজন গ্রাহক চেয়েছে ও। কাকে তিনি গ্রাহক হতে বলবেন? দিল্লির অভিজাত ধনীদের অবস্থা তো খুবই খারাপ। খবর কাগজ কেনার সামর্থ্যটুকু নেই। দু-একজনকে বলার পরে আহসানউল্লা খান গ্রাহক হতে রাজি হয়েছেন। আর কাউকে পাওয়া যায় নি।

তিনি চুপচাপ বসে না থেকে আরামকে চিঠি লিখতে বসলেন। বেশ তিক্তভাবে লিখলেন--সেইসব ব্যক্তিকে কোথায় খুঁজে পাবো যারা খবরের কাগজ কিনবে? দিল্লিতে এখন যাদের হাতে টাকা আছে তারা ব্যাপারি ও মহাজন। ওরা শুধু জানতে চায় যে কোথায় সস্তায় গম পাওয়া যাবে। খবরের কাগজ পড়ার সময় ওদের নাই। ইচ্ছাও নাই। ওরা যদি সৎ ও উদার হয় তাহলে তোমার কাছে সঠিক মাপে গম বিক্রি করবে। তা নাহলে পাল্লায়ও ফাঁকি থাকবে। খবরের কাগজ কিনে পয়সা নষ্ট করবে কেন ওরা? তোমার সংবাদপত্রের গ্রাহক যোগাড় করতে পারা কঠিন।

চিঠিটি লিখে তার বুক আবার ভার হয়ে গেল। ভাবলেন, দিল্লি শহরের এমন পরিণতি তাঁর স্বপ্নেরও অতীত। ক্রমাগত বুক ভার হয়ে যায়। অভিজাতদের হাত থেকে দিল্লি চলে যাচ্ছে বণিকশ্রেণীর হাতে।

তিনি জানেন আরাম কবিতা লেখে। ও একজন ভালো কবি। তার প্রিয় সাগরেদদের একজন। ওর পুরো নাম রায়বাহাদুর মুনশী শিবনারায়ণ আরাম এলাহাবাদী।

গালিব চিঠি খামে ভরে গাম দিয়ে আটকালেন। তারপর কাল্লুকে ডেকে তাকে মদ দিতে বললেন।

কাল্লু অবাক হয়ে বলল, হুজুর এখন?

হ্যাঁ, এখনই।

তাহলে পেয়ালা নিয়ে আসি।

সেদিন পুরোটা সময় তিনি মদ খেয়ে কাটালেন। কারও কথা শুনলেন না। উমরাও জানেরও না। তারপর দিন ঘুম ভাঙল তার ভর দুপুরে। বিছানায় উঠে ভাবার চেষ্টা করলেন যে কতটা সময় পার হয়ে গেছে, না কি সময়টা তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে? বলছে, গালিবের ঘুম ভাঙুক। তারপরে পা বাড়াব।

সেদিন বিকেলে বাড়িতে এলো হাফিজ মাম্মু। গালিবের অনেক দিনের পরিচিতজন। বিপদে-আপদে কাছে থাকে। ওর শুকনো চেহারা দেখে গালিব বুঝলেন যে কিছু হয়েছে। হাফিজ ধপ করে শতরঞ্জির ওপর বসে পড়ে।

কী হয়েছে? বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফেরত পাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে? কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে পেরেছ?

হাফিজ মাম্মু একটুক্ষণ দম নিল। অনেকটা পথ হেঁটে আসার কারণে বুকে হাঁফ ধরেছে।

তোমাকে পানি দিতে বলব?

মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানায় হাফিজ। গালিব আয়েজকে পানি আনতে বলেন। পানি খেয়েও হাফিজ মাম্মু চুপ করে বসে থাকে।

সম্পত্তি ফেরত পাওয়ার জন্য কাগজপত্র যা তৈরি করতে বলা হয়েছিল, করেছিলে?

সব করেছিলাম। কাগজপত্রে কোনো ভুল নাই।

তাহলে সমস্যা কোথায়?

সমস্যা আমার নামে।

হাফিজ মাম্মুর চোখ জলে ভরে যায়। গালিব অবাক হন। তার পরের কথা শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকেন। হাফিজকে কিছু জিজ্ঞেস করেন না।

হাফিজ চোখ মুছে বলে, কমিশনার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন হাফিজ মহম্মদ বখশ কে? আমি বললাম, আমি। তিনি বললেন, তাহলে হাফিজ মাম্মু কে? বললাম, হুজুর দুটো নামই আমার। আমার আসল নাম হাফিজ মহম্মদ বখশ। লোকে আমাকে হাফিজ মাম্মু বলে ডাকে। কমিশনার রেগে উঠলেন। বললেন, সব নামই আপনার একার। ভালোই বলেছেন। কিন্তু এতে আমি কিছু বুঝতে পারছি না। কাকে আমি এই বাড়ি ফেরত দেব? এর কিছু করা যাবে না। কেস বাতিল। আপনি যান। আমাকে খালি হাতে ফিরে আসতে হলো। এখন আমি কী করব? আমিতো নিঃস্ব হয়ে গেলাম।

দুহাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়ে হাফিজ। গালিব ওর মাথায় হাত রাখেন। আয়েজকে ডেকে আরেক গ্লাস পানি আনতে বলেন। একসময়ে নিঃশব্দে উঠে চলে যায় মাম্মু।

গালিব মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকেন। মহল্লার লোকজনের কাছে যা শুনলেন তাই হলো। ওরা বলাবলি করে, সম্পত্তি ফেরত দেওয়া আর ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকার স্বেচ্ছাচারী আচরণ করে। যা খুশি তাই করে।

আগেকার প্রথা, নতুন আইন, নিয়মকানুন বা যুক্তির কোনো মূল্য ছিল না তাদের কাছে।

হাফিজ মাম্মুর নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার খবরে প্রথমে মন খারাপ হলেও পরে ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন গালিব। তুফতাকে চিঠিতে লিখলেন—জানতে পেরেছি যে লাহোরে একটি ক্ষতিপূরণ বিভাগ চালু করা হবে। এই অফিসের মাধ্যমে শতকরা দশভাগ মূল্যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। তবে দেওয়া হবে তাদেরকে যাদের সম্পত্তি সিপাইরা লুট করেছিল। নিয়ম করা হলো এমন যে যাদের এক হাজার টাকার দাবি নির্ধারণ করা হবে সে পাবে একশ টাকা। মজার বিষয় হলো যে দিল্লি দখল করার পরে সাহেবরা যে লুট করেছে তার কোনো কিছুই ক্ষতিপূরণের মধ্যে পড়বে না। সাহেবরা যা লুট করেছে তা মওকুফ করে দেওয়া হবে। বন্ধু, ভেবে দেখো কত কষ্ট প্রতিদিন জমা হয় বুকের ভেতর। এখন থেকে কেমন করে হাফিজ মাম্মুর মুখের দিকে তাকাব? দুঃখে ভারাক্রান্ত হাফিজ কি আর আগের মতো আমার কাছে আসবে? খোশগল্প করার মন কি ওর আর থাকবে? দেখতে পাচ্ছি অনবরত পরিচিতজনদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। বেশির ভাগ দিনই আমার সঙ্গীহীনভাবে একা একা কাটে। কথা বলার লোক কম পাই। চিঠি লিখে বন্ধুর সঙ্গ পাই। এখন কলম আমার সঙ্গী। আর সঙ্গী নিজের ছায়া। বন্ধু আমার জন্য প্রার্থনা করো। ঘরোয়া মুশায়রার আসরে এখন আর শুনতে পাই না বহুৎ আচ্ছা, মারহাবা ধ্বনি! ওহ্ কী ভয়ঙ্কর দিনের ছায়া আমার মাথার ওপরে বিছিয়ে আছে!

চিঠি শেষ করে খামে ঢোকালেন। যত্ন করে নিজের হাতে তৈরি করা খাম।

একই সঙ্গে চিঠি লিখলেন কমিশনারকেও। লর্ড ক্যানিং ইংল্যান্ডের রানির কাছ থেকে এ দেশের প্রতিনিধি শাসক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। তাঁকে একটি কসীদা পাঠাবেন ঠিক করলেন। সঙ্গে এক কপি 'দস্তাম্বু'ও। সে দিন শহরটিকে আলো দিয়ে সাজানো হয়েছিল। কিন্তু তাতে কী? তাতে তাঁর মন আলোকিত হয় নি।

দুই নাতি বায়না ধরেছিল, নানাজান আমরা বাতি দেখতে যাব আপনার সঙ্গে। আপনি আমাদের নিয়ে চলেন।

তিনি যান নি। তিনি গম্মনকে বলেছিলেন ওদের বাতি দেখাতে নিয়ে যেতে। এখন আর এসবে তাঁর উৎসাহ নেই।

খবর পেয়েছেন তাঁর বই 'দস্তাম্বু' ভালো বিক্রি হচ্ছে। তিনি বইয়ের পাঁচ কপি বিশেষভাবে তৈরি করার জন্য বলেছিলেন আরামকে।

আরাম হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করেছিল, বিশেষ পাঁচ কপি বই কার জন্য মির্জা নওশা সাহেব?

তিনি নির্বিকার কণ্ঠে বলেছিলেন পাঁচ বিশেষ ব্যক্তি হলেন পাঞ্জাবের প্রধান কমিশনার, গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং, কুইন ভিক্টোরিয়া এবং ব্রিটিশ সরকারের নির্দিষ্ট দুজন সচিব।

আরাম হেসেই বলেছিল, এতে পেনশনের একটা সুরাহা হতে পারে।

ওই পেনশন ছাড়া আমার তো কোনো উপার্জন নাই। গম্ভীর হবেন না মির্জা নওশা। আমি পুরো বিষয়টি জানি। আমি আপনাকেও বুঝতে পারি। আভিজাত্যের অহমিকায় আপনি ভীষণ পরিতৃপ্ত।

www.BanglaBook.org

অভিজাত মানুষের পরিতৃপ্ত থাকাই তো উচিত।

তাহলে কষ্ট পান কেন?

কবি যে, ভাই।

হো-হো করে হেসেছিল আরাম।

গালিব এখন চিঠি লিখছেন-'দস্তাম্বু' বেশ বিক্রি হচ্ছে। আমার এক বন্ধু অনেকগুলো কপি বিক্রি করে দিয়েছে। লেফটেন্যান্ট গভর্নর প্রশংসা করে চিঠি লিখেছেন। ভেবে অবাক হই যে কারা এই বইগুলো কিনল-ইংরেজ না ভারতীয়? আমি তো দেখতে পাই ভারতবর্ষ থেকে আলো মিলিয়ে যাচ্ছে। যারা প্রদীপের মতো জ্বলত তারা আর নেই। এ দেশের মাটি প্রদীপমূল্য। লক্ষের ওপরে মানুষ জেলে বন্দি। যারা জেলের বাইরে আছে তাদের বই কেনার সামর্থ্য নেই। ইচ্ছে থাকলেও সাধ্য নেই। যারা আমার বই কিনেছে বলে ধারণা করি তারা ইংরেজ আর তারা কেনা কপিগুলো পাঞ্জাবে পাঠিয়েছে। আমরা তো জানি পাঞ্জাব সবসময় ব্রিটিশদের পক্ষে ছিল।

পরদিন বিকেলে কবি মজরুহ তাঁর জন্য এক বাক্স উপহার পাঠালেন। মীর মেহদী মজরুহ গালিবের বন্ধু ও সাগরেদ উর্দু ভাষায় লেখেন। উপহারটি নিয়ে এলেন সৈয়দ আহমদ হুসেন। সঙ্গে একজন ভৃত্য এল। বাক্সটি দেখে গালিব মনে মনে খুশি হলেন। ভাবলেন নিশ্চয় মদ আছে। সেই যে মহেশ দাস এক বোতল দিয়ে গেল সে তো কবেই শেষ। এখন দিন বড় শুকনো। পিপাসায় কাতর তিনি।

হুসেনকে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছেন আমার কবি বন্ধু? তাঁর লেখালেখি হচ্ছে তো? উপহারের জন্য তাকে আমার শুকরিয়া জানাবে।

সৈয়দ আহমদ হুসেন চলে গেলে ছুটে আসে নাতিরা।

নানাজান বাক্সে কী আছে?

কাল্লুকে ডাক।

দুজনে ছুটে গিয়ে কাল্লুকে ধরে নিয়ে এল। খোলার পরে দেখা গেল বাক্সভর্তি আম। গালিব প্রথমে মন খারাপ করলেন। পরে ভাবলেন আম তাঁর প্রিয় ফল। বাচ্চারা খাবে। উমরাও জান খাবে। সবাই মিলে খেলে আম-খাওয়ার উৎসব হবে। ক্ষতি কী?

কাল্লু মিয়া বলল, হুজুর আপনার জন্য কেটে নিয়ে আসি।

না কেটো না। আমি গোটা আম চুষে খাব।

আপনি তো এভাবে খান না।

আজ খাব। তুমি বাক্স নিয়ে যাও।

কাল্লুর সঙ্গে বাচ্চারা চলে গেলে তিনি অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। আমের সঙ্গে তাঁর বাদশার স্মৃতি জড়িয়ে আছে। কেমন আছেন তিনি রেঙ্গুনে? মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গনা মাত্র কি? একবার বাদশা আমের মৌসুমে তাঁর সভাষদদের নিয়ে হায়াত বখশ উদ্যানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। বাগান ভর্তি ছিল আমগাছ। গাছ ভর্তি ছিল আম। নানারকম আম। তবে সেই উদ্যানের আম বাদশা, মহলের বেগমরা, শাহজাদা-শাহজাদীরা ও শাহী কর্মচারীরা খেতেন। আর কারও খাওয়ার হুকুম ছিল না। গালিব বাগানে ঘুরতে ঘুরতে খুব মনোযোগ দিয়ে আম দেখছিলেন-তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ফল। বাদশা তাঁর দিকে তাকিয়ে কৌতুকের সঙ্গে বলেন, মির্জা এত মনোযোগ দিয়ে কী দেখছেন?

তিনি বলেছিলেন, হুজুর একজন দরবেশ বলেছিলেন, খাদ্যের প্রতিটি দানায় খাদকের এবং তার বাপদাদার নাম লেখা থাকে। তাই আমি খুঁজে দেখছিলাম যে কোন আমে আমার এবং আমার বাপদাদার নাম লেখা আছে।

সে দিন বাদশা তাঁর রসবোধে প্রীত হয়েছিলেন। হাসতে হাসতে কর্মচারীকে বলেছিলেন, তাঁর বাড়িতে এক ঝুড়ি আম পাঠিয়ে দিতে। সে দিনই তাঁর বাড়িতে আমের ঝুড়ি পৌঁছে গিয়েছিল।

অল্পক্ষণে উমরাও জান এসে হাজির। খুশিতে চকচক করছে তাঁর দৃষ্টি। বলেন, বাচ্চারা আম পেয়ে তো ভীষণ খুশি। কতদিন যে ওরা আম খায় নি।

বিবি আমাকে অপরাধী করছ?

মোটেই না। আমি আপনার বন্ধুদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আপনার বন্ধুরা আপনাকে কত যে উপহার পাঠায়।

আমার বন্ধু তো শুধু দিল্লিতে নেই বিবি। আমার বন্ধু আছে ভারতবর্ষ জুড়ে।

উমরাও জন হাসতে হাসতে বলেন, চিঠি দিয়েই আপনার বন্ধুত্ব।

চিঠি দিয়েই তো যোগাযোগ রেখেছিলম। গদরের আগে কতজন আমার এখানে আসত।

তা ঠিক। এখনকার মতো এত একা একা আপনাকে থাকতে হয় নি।

সত্যি। গালিব দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

উমরাও যান উঠে যেতে যেতে বলেন, আম খান। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন, মনে আছে, একদিন আপনি হাকিম রজিবউদ্দিন খাঁকে কী বলেছিলেন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ খুব মনে আছে। তোমারও মনে আছে দেখছি।

আম দেখলে আপনার কৌতুকের কথা মনে হয় আমার।

তাহলে, আরেকটু বসো। দুজনে মিলে কৌতুকটা স্মরণ করি। বিবি এইসব দিনে হাসি খুব দুর্লভ হয়ে গেছে।

উমরাও জান বসলেন

গালিব বললেন, রজিবউদ্দিন আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমরা বৈঠকখানায় বসে গল্প করছি। একজন লোক তার গাধা নিয়ে গলি দিয়ে যাচ্ছিল। গলিতে পড়ে ছিল আমের খোসা। আমরা তো জানি গাধা অনেকসময় কোনো একটা জিনিস হয়ত খাবে না, কিন্তু শুঁকে ছেড়ে দেয়। রজিবউদ্দিন আম পছন্দ করতেন না। খেতেনও না। তিনি জানতেন আমি আম পাগল মানুষ। আমাকে খোঁচা দেয়ার জন্য বললেন, মির্জা সাহেব দেখলেন, আম কী রকম জিনিস, যেটা গাধাও খায় না। আমি সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলাম, হ্যাঁ, অবশ্যই গাধারা তো আম খায়ই না।

তিনি আমার রসিকতা বুঝেছিলেন। লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছিল তার চেহারা।

উমরাও জান হাসতে হাসতে চলে গেলেন।

গালিব নিজেও হাসলেন। তারপর গোটা আম দাঁত দিয়ে ফুটো করে চুষে খেলেন।

খেয়েদেয়ে মজরুহকে লিখলেন, তোমার উপহার বাক্সটি দেখে ভেবেছিলাম তুমি বুঝি আমার জন্য বোতল পাঠিয়েছ। দেশী শরাব। বুকে বড় পিপাসা। বাক্স খুলে পেলাম আম। মন্দের ভালো বলতে হবে। আমি তো আম খেতে ভালোবাসি তুমি তা জানো। তোমার পাঠানো আম দিয়ে মনের ক্ষুধা মিটিয়েছি একভাবে। ধরে নিয়েছি এক একটি আম এক একটি পেয়ালা। পেয়ালায় ভরা আছে দ্রাক্ষাজাত আসব। আর এ পেয়ালা এমনই সুন্দরভাবে পূর্ণ যে এক ফোঁটাও ছলকে পড়ার ভয় নেই। একরকম ইংরেজি মদ আছে, যার নাম লিকার। অপূর্ব পানীয়, দেখতেও সুন্দর, চমৎকার রঙ। আর এত সুস্বাদু যে মনে হবে চিনির পাতলা সিরাপ খাচ্ছ। বন্ধু, তোমার লিখনশৈলী এমন মিষ্টি। তোমার গজল যখন পড়ি তখন মনের আনন্দে পূর্ণ হই। তুমি বর্তমান সময়ের উর্দু কবিদের একজন। প্রার্থনা এই যে কাল যেন তোমাকে ফেলে না দেয়।

চিঠি শেষ করে খামে ঢোকালেন। কাল্লুকে দিয়ে পাঠালেন ডাকে দেয়ার জন্য।

পরদিন দিল্লির কমিশনারের কাছ থেকে চিঠি পেলেন দেখা করার জন্য। খুবই খুশি হলেন। পেনশনের ব্যাপারে আশাবাদী হলেন। তাঁকে 'দস্তাম্বু' পাঠিয়েছেন। রামপুরের নওয়াব বরাবরই ইংরেজদের পক্ষে। তিনি তাঁর পেনশনের জন্য চেষ্টা করছেন। স্যার সৈয়দ আহমদও চেষ্টা করছেন। হয়ত এবার একটা কিছু হবে।

তিনি নির্দিষ্ট দিনে ঠিক সময়ে গেলেন।

কর্মচারী জানাল, আজকে দেখা হবে না।

গালিব আহত স্বরে বললেন, হবে না?

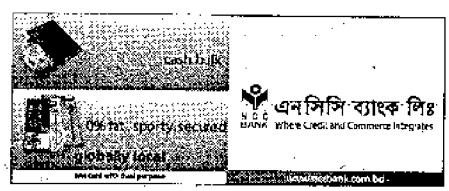

www.BanglaBook.org

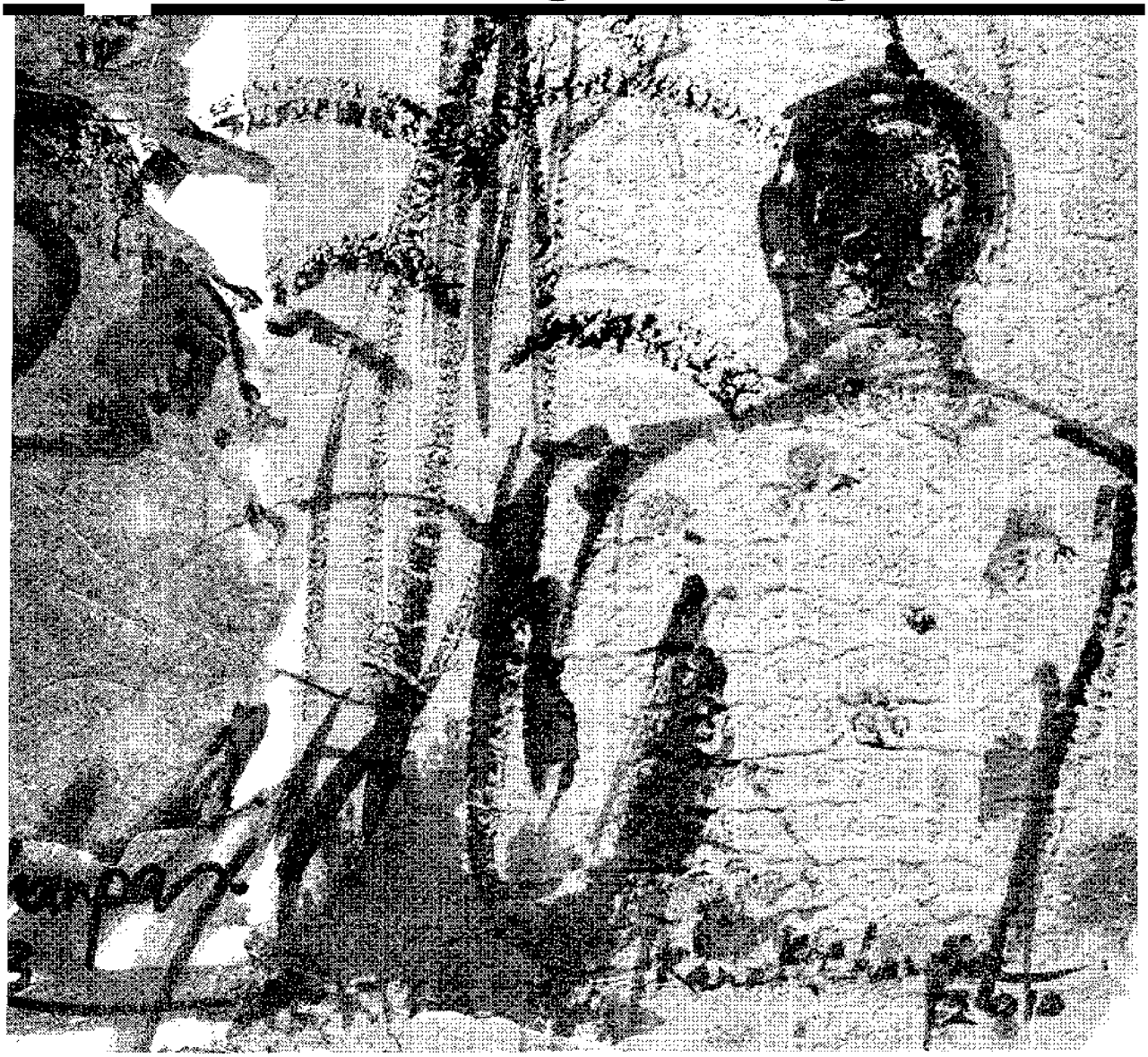

না, হবে না। স্যার, শিকার করতে যাচ্ছেন। আপনি কাল আসেন।

গালিব নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরলেন।

পরদিন আবার গেলেন।

কমিশনার হাসিমুখে তাঁকে বসতে বললেন। জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছেন?

জ্বি হুজুর, ভালো আছি।

কমিশনার তাঁকে চার পৃষ্ঠার একটি চিঠি দেখিয়ে বললেন, ম্যাকলড সাহেব এই চিঠি পাঠিয়েছেন। তিনি আমাকে আপনার অবস্থা বিষয়ে খোঁজ নিতে বলেছেন। এ ব্যাপারে তাঁকে একটি প্রতিবেদন পাঠাতে বলেছেন।

গালিব মুখে কিছু বললেন না। কিন্তু মনে মনে খানিকটা আশ্বস্ত হলেন। দেখলেন কমিশনার কী একটা কাগজ পড়তে শুরু করলেন। গালিবের মনে পড়ল গতবার যখন দিল্লিতে এসেছিলেন তখন অনুষ্ঠানিকভাবে দরবার বসানো হয়েছিল। এটাই সৌজন্যমূলক প্রথা। লর্ড হার্ডিঞ্জ দিল্লিতে যখন শেষ দরবার করেছিলেন তখন তাঁর জন্য একটি সম্মানসূচক আসন রাখা হয়েছিল। ডানদিক থেকে দশম স্থানটি তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। তাঁকে একটি চাদর, রত্নখচিত সূক্ষ্ম কারুকাজ করা পাগড়ি মুক্তোর মালা এবং সিল্কের জোব্বা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এবার অনেক অভিজাতকে দরবারে আমন্ত্রণই জানানো হয় নি। তার মধ্যে গালিবও ছিলেন। এজন্য তিনি অনেক মনোক্ষুণ্ণ হয়ে আছেন। আজকে কমিশনারের কাছ থেকে ভালো ব্যবহার পেয়ে খানিকটুকু প্রীত হয়েছেন। খুশি মনেই অপেক্ষা করছেন। তাঁর ধারণা কমিশনার নিশ্চয়ই 'দস্তাম্বু' পেয়েছেন।

তখন কমিশনার জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কী বই লিখেছেন?

গালিব 'দস্তাম্বু'র কথা বিস্তৃতভাবে বললেন।

কমিশনার খুশি হয়ে বললেন, ম্যাকলড সাহেব এই বইয়ের আরেকটি কপি চেয়েছেন। আমাকেও আরেকটি কপি দেবেন।

জ্বি স্যার।

আপনার পেনশনের ব্যাপারে দরখাস্ত পেয়েছি। বিষয়টি আমি দেখছি। আপনি

www.BanglaBook.org

সোমবারে আসবেন।

তিনি সোমবারে যথাসময়ে কমিশনারের অফিসে হাজির হলেন। বই এবং ম্যাকলাড সাহেবকে দেয়ার জন্য একটি দরখাস্ত নিয়ে এসেছেন। কমিশনারকে এসব দেয়ার পরে তিনি বললেন, আমি আপনার পেনশনের ব্যাপারে এজারটন সাহেবকে লিখেছি। আপনি তার সঙ্গে দেখা করবেন।

গালিব খুশি মনে বাড়ি ফিরলেন।

সব শুনে উমরাও জান খুশি হয়ে বললেন, আল্লাহ এতদিনে মুখ তুলে চেয়েছেন। খোদা মেহেরবান।

পুরো বকেয়াটা পেলে তো আমার আনন্দের সীমা থাকবে না বিবি। সব টাকা পেলে আমার নিজের জন্য কিছু খরচ করব।

আমার দুঃখ হয় এজন্য যে আপনার পছন্দের পোশাক তো অভাবের জন্য বিক্রি করতে হয়েছে। এখন ভালো পোশাক বলতে কিছুই নাই। এখন তো আপনাকে নানা জায়গায় যেতে হচ্ছে।

এটাও অবশ্য ঠিক, এখন আমার যৌবন নাই। বয়সও নাই পোশাকে আর কীই বা আসে যায়?

বয়সকালে আপনার নিত্যনতুন পোশাক না হলে চলত না। আমার আব্বা আপনাকে অনেক পোশাক বানিয়ে দিতেন।

আমার শ্বশুর আমাকে খুব ভালোবাসতেন। তাঁর বাড়িতে আমি খুব যত্ন-আদরে ছিলাম।

আপনাকে শুকরিয়া যে আপনি আমার আব্বাজানের কথা এভাবে মনে রেখেছেন।

বিবি, আমি তো বেইমান না।

উমরাও জান কোনো কথা না বলে ঘর ছাড়েন। তাঁর নিজের জীবনে অনেক দুঃখ হচ্ছে না। বেদনার সবটুকু যে ভুলে গেছেন তা তো নয়। বাইরে বাচ্চাদের হৈ-হল্লা শোনা যাচ্ছে। ওদের পোশাকও জীর্ণ হয়ে গেছে। পেনশনের বকেয়া পেলে ওদেরকেও ভালো পোশাক বানিয়ে দিতে হবে।

কদিন পরে কমিশনার আবার ডেকে পাঠালেন গালিবকে। তিনি জানালেন, গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং পাঞ্জাবের গভর্নরকে লিখেছেন আপনার পেনশন মিটিয়ে দিতে। অবশ্য যদি দিল্লির কমিশনার আপনার পক্ষে রিপোর্ট দেন।

গালিব চুপ করে শোনেন।

তিনি আবার বলেন, এরপর থেকে আপনাকে মাসে মাসে নিয়মিত পেনশন দেয়া হবে।

এর জন্য কতদিন অপেক্ষা করতে হবে তার কি কোনো নির্দিষ্ট তারিখ আছে?

না, তা নেই তবে আপনি ইচ্ছা করলে এককালীন একশ টাকা অনুদান নিতে পারেন।

গালিব ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন, অন্যরা যখন এক বছরের বকেয়া টাকা পেয়েছেন তখন আমি মাত্র একশ টাকা নেব কেন?

কমিশনার বললেন, কিছুদিনের মধ্যেই আমি আপনাকে পুরো টাকাটা দিতে পারব। পেনশনও পেয়ে যাবেন।

তাঁর কথা শুনে গালিব নিজেকে শান্ত করলেন। কয়েকদিন পরে একশ টাকা তুলে নিলেন।

দিন গড়ালো।

মাস গড়ালো।

একদিন বকেয়াসহ পেনশন পেলেন গালিব।

তিন বছরের বকেয়া পেলেন। টাকার অঙ্ক দু'হাজার দুশো পঞ্চাশ। এর মধ্য থেকে বাদ গেছে একশ টাকা, যেটা তিনি অনুদান হিসেবে নিয়েছিলেন। অন্যান্য খাতের হিসাবে আরো দেড়শ টাকা বাদ গেল। থাকল দুই হাজার টাকা।

একজন মহাজন এসে সামনে দাঁড়াল।

তাঁর কাছ থেকে ধার নিয়েছেন দেড় হাজার টাকা। ধার করেই তো বেঁচে ছিলেন এই তিন বছর।

মহাজন বলল, আমার পুরো টাকাটা শোধ করে দিন। পাঁচশ টাকা নিয়ে বাড়ি যান।

গালিব বললেন, আরেকজনের কাছে আমার এগারোশ টাকা ধার রয়েছে। তাকেও তো আমার কিছু টাকা শোধ করতে হবে।

আমি অতশত জানি না। আমার টাকা আমি আগে নেব।

আমার তো আরো পাওনাদার আছে। সবার দাবি আমার কাছে সমান।

গালিব রাগ করতে করতে ফিরে আসেন বাড়িতে। সোজা অন্দরমহলে যান। উমরাও জানকে বলেন, বকেয়া টাকা যা হাতে পাব তার সবই চলে যাবে ধার শোধ করতে।

উমরাও জান দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, ধার করেই তো আমরা বেঁচে আছি এই তিন বছর। দেনা তো শোধ করতেই হবে।

যা টাকা পাব তা দিয়ে সব দেনা শোধ হবে না।

বলতে বলতে গালিব উমরাও জানের শোবার ঘরে আসেন। পেছনে পেছনে উমরাও জানও আসেন। শোবার ঘরে দুজনে মুখোমুখি দাঁড়ান।

আপনি পোশাক বানাবেন বলেছিলেন।

হবে না।

তাতে কী, না হয় আবার ধার করবেন। তবু নতুন পোশাক তো চাই।

গালিব মৃদু হেসে বলেন, তোমাকে শেখ আলী হাজিনের একটি শের শোনাব বিবি?

বলেন।

গালিব বেশ দরাজ গলায় আবৃত্তি করেন,

'ধার করে পরতাম পোশাক যখন অল্প ছিল বয়স,

প্রেমিক হৃদয়ে ছিল অপরূপ উন্মাদনার আবেশ।

এখন পরনে জোব্বা জীবনের শেষ,

লজ্জা দেয় না তাই আমার এ বেশ॥'

গালিব থামলে উমরাও জানের চোখ ছলছল করে। গালিব তার দিকে তাকিয়ে থমকে যান।

উমরাও জান বলেন, আপনার কষ্ট হচ্ছে?

তিনি সজোরে মাথা নেড়ে বলেন, না।

আমার কষ্ট হচ্ছে। আপনি নতুন পোশাক পরতে ভালোবাসতেন।

গালিব আবারও সজোরে বলেন, না।

আমি আপনাকে পঞ্চাশ বছর ধরে দেখে আসছি।

হ্যাঁ, আমরা তো একসঙ্গে এতগুলো বছর কাটালাম। সুখে- দুঃখে আমাদের জীবনটা কেটে গেল।

গালিব বিড়বিড় করে বলেন, কেটেই গেল। তারপর একই ভঙ্গিতে আউড়ান নিজের শের:

'প্রেমেই জীবনের স্বাদ পেল আমার মন;

ব্যথার ওষুধ পেল, এমন ব্যথা পেল যার ওষুধ নেই॥'

শের শুনে ওড়নায় চোখ মুছলেন উমরাও জান। কান্নার অস্ফুট ধ্বনিও বেরিয়ে এল।

গালিব তার হাত ধরলেন। তাকে টেনে নিয়ে দুজনে পাশাপাশি বসলেন।

উমরাও জানের ঘাড়ে হাত রেখে বললেন, পেনশনের বকেয়া পেলে আগে তোমার জন্য ঘাগরা আর ওড়না কিনব বিবি।

না, আমার জন্য না। আপনারটা আগে।

আচ্ছা, ঠিক আছে, দুজনের জন্যই কিনব।

আর দেনা?

দেনা করলাম আর মদ খেলাম। এভাবেই জীবন উড়িয়ে দিলাম। আর কটা দিনই বা বাঁচব!

এভাবেই কাটুক না শেষ দিনগুলো।

উমরাও জান স্বামীর হাত শক্ত করে ধরলেন। যেন কিশোরী বেলার গালিব তাঁর কাছে ফিরে এসেছে। বলছে, চলো বাগানে যাই। সবচেয়ে সুন্দর ফুলটি তোমাকে দেব। ■